গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৭ বর্ষ ৪৩ সংখ্যা ১ - ৭ জুলাই, ২০০৫ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

পেট্রল ডিজেলের দামবৃদ্ধির প্রতিবাদে ২১ জুন কলকাতায় বিক্ষোভ

পেট্রল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি ● সিপিএমের নকল প্রতিবাদ, ভুয়া আন্দোলন

জনগণকে যথার্থ আন্দোলনে এগিয়ে আসার ডাক দিল এস ইউ সি আই

২৬ জুন কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন —

কেন্দ্রীয় সরকার অন্যায়ভাবে পেট্রল ও ডিজেলের যে দাম বাড়িয়েছে তা আদৌ সম্ভব হত না যদি সিপিএম দল পেছন থেকে সমর্থন না করত। সিপিএম নেতৃত্ব একদিকে কেন্দ্রের এই জনবিরোধী সিদ্ধান্তকে সমর্থন করছে, অন্যদিকে বাইরে কিছু লোকদেখানো 'প্রতিবাদ' করে এবং 'আন্দোলনের' মহড়া দিয়ে দলের সৎ কর্মী সমর্থক এবং জনগণকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে। একবছর আগে সিপিএমের সমর্থনে যখন কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হয় তখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী অসতর্কভাবে সদর্পে একটি সত্য কথা বলেছিলেন যে, এই সরকার সিপিএম উঠতে বললে উঠবে, বসতে বললে বসবে। বাস্তব ঘটনাও তাই। জনসাধারণ দেখছে — সিপিএম দলের নেতাদের সাথে কংগ্রেস নেতাদের ঘন ঘন বৈঠক হচ্ছে, কংগ্রেস সভানেত্রীর বাড়িতে ব্রেকফাস্ট, প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে ডিনার, সিপিএম নেতাদের সাথে কংগ্রেস নেতা ও প্রধানমন্ত্রীর সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার চলছে। এগুলি তাদের গভীর বোঝাপড়া ও ঘনিষ্ঠতারই পরিচায়ক এবং সিপিএমের পরামর্শ ছাড়া কংগ্রেস নেতৃত্ব যে এক পা-ও চলে না, সেটাও পরিষ্কার। মালিকের দালাল ইউনিয়ন বাইরে শ্রমিকদের নিয়ে যেমন জঙ্গি আন্দোলনের মহড়া দেয় আবার মালিককে ভেতরে ভেতরে আশ্বস্ত করে, তেমনি সিপিএম নেতৃত্ব কংগ্রেস নেতৃত্বকে পাঁচ বছরের স্থায়িত্বের গ্যারান্টি দিয়েছে, দেশি-বিদেশি পুঁজির স্বার্থে যেকোন জনবিরোধী নীতি গ্রহণে সম্মতি জানিয়েছে এবং সাথে সাথে এটাও জানিয়ে রেখেছে যে, তারা বাইরে 'প্রতিবাদ' এবং 'আন্দোলনের' নাটক করে যাবে।

পাঁচের পাতায় দেখুন

বিশ্ববাজারে দামবৃদ্ধি অজুহাত মাত্র

কেন্দ্রীয় সরকার বলছে, বিশ্ববাজারে অশোধিত তেলের দাম বাড়ায় পেট্রলে লিটার প্রতি ২.৫০ টাকা ও ডিজেলে লিটার প্রতি ২ টাকা না বাড়িয়ে উপায় নেই। তেল কোম্পানিগুলির লোকসান মেটাতে এর চেয়ে বেশি বাড়ানোই নাকি দরকার ছিল, জনগণের কষ্টের কথা ভেবে কম করেই বাড়ানো হয়েছে। দিল্লীর বন্ধু ''বামপন্থী''রা বলছে তাদের চাপেই মূল্যবৃদ্ধি কম করতে হয়েছে। সত্যিই কি তাই? তথ্য বলছে উল্টো কথা।

কত ছিল তেলের দাম? গত ৭ ডিসেম্বর রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় পেট্রলিয়াম মন্ত্রী মণিশঙ্কর আয়ার বলেছিলেন, কর ও শুল্ক তুলে নিলে পেট্রলের দাম হয় লিটার পিছু ১৭.৪৬ টাকা এবং ডিজেল ১৮.০৭ টাকা। বিশ্ববাজারে অশোধিত তেলের দাম প্রায়ই ওঠানামা করে। বর্তমানে দাম বাড়ার পর ২৩ জুনের দর অনুযায়ী কর ও শুল্ক বাদে পেট্রলের দাম দাঁড়িয়েছে ১৭.৫১ টাকা ও ডিজেলের দাম ১৮.৫৩ টাকা। (দ্রঃ

পাঁচের পাতায় দেখুন

পেট্রল ডিজেলের দামবৃদ্ধির প্রতিবাদে ২১ জুন বিক্ষোভ। বাঁদিকে কেরালা, মাঝে দিল্লি, ডানদিকে ত্রিপুরা

কলকাতা পুরনির্বাচনে ব্যাপক রিগিং

গণতন্ত্র ধ্বংসে সিপিএমের ভূমিকাই প্রমাণ করে তারা সত্যিকারের কমিউনিস্ট নয়

দুই বিরোধী জোট মিলে মোট যত আসন পেয়েছে, তার থেকে বেশি ৯ টি আসনের ব্যবধান নিয়ে কলকাতা পুরসভায় জয়ী হয়েছে সি পি এম-ফ্রন্ট। ১৪১ টি আসনের মধ্যে তারা পেয়েছে ৭৫ ; অন্যদিকে তৃণমূল-বিজেপি জোট পেয়েছে ৪৫ এবং কংগ্রেস ও সুব্রত মুখার্জীর উন্নয়ন মঞ্চ মিলে পেয়েছে ২১।

সি পি এম নেতারা বলেছিলেন, এবার তাঁরা কলকাতা পুরসভা দখল করবেন। এই দখল বলতে আক্ষরিক অর্থে প্রকৃত যা বোঝায় তার জন্য বিপুল অর্থব্যয়ে প্রচারের বন্যা থেকে শুরু করে অন্য যা যা করা দরকার তার সমস্ত বন্দোবস্ত তাঁরা করেছিলেন। ইঁদুর মারার জন্য বেড়ালের রঙ কালো না সাদা সে বিচার তাঁরা করেননি। তাঁদের লক্ষ্য সফল হয়েছে, এতে তাঁদের খুশি হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু সি পি এম নেতৃত্ব শুধু আনন্দ প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হননি, তাঁদের জয় ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনেক নীতি-আদর্শের কথাও বলেছেন। ভোটের জয় সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করে সি পি এম রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস একটি লিখিত বিবৃতিতে বলেছেন, ''এই রায় বামফ্রন্টের উন্নত রাজনৈতিক অবস্থান, ইতিবাচক বক্তব্য ও কর্মসূচির প্রতি সমর্থন'' (গণশক্তি, ২২-৬-০৫)। পত্রিকার সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, ''বামফ্রন্ট সরকারের ব্যাপক উন্নয়নমূলক কাজকর্ম, কলকাতার উন্নয়ন সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিশা, রাজ্য সরকারের স্বচ্ছতা ও রাজনৈতিক সততা, বামফ্রন্টের ঐক্য ও উন্নত মতাদর্শ মানুষের মনে গভীর প্রভাব ফেলেছে।'' সি পি এম নেতা আরও বলেছেন, ''গত পাঁচ বছর তৃণমূল-বিজেপি পরিচালিত বোর্ডের অপদার্থতা ও বিরোধীদের নীতিহীনতার বিরুদ্ধেও জনগণের ক্ষোভ প্রতিফলিত হয়েছে।'' অর্থাৎ, সি পি এম নেতৃত্ব বোঝাতে চান যে, তাঁদের 'উন্নত নীতি-আদর্শ' এবং তৃণমূল-বিজেপি জোট তথা বিরোধীদের নীতিহীনতার জন্যই তাঁদের এই জয় ঘটেছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, সি পি এম নেতার বিবৃতি অথবা গণশক্তির সম্পাদকীয় — কোথাওই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একটি শব্দও উচ্চারণ করা হয়নি, কংগ্রেস সম্পর্কে নীতিহীনতার অভিযোগও আনা হয়নি। কিন্তু ভোটের প্রচারে সি পি এম নেতারা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অজস্র বার নীতিহীনতার অভিযোগ এনেছেন, পশ্চিমবঙ্গে

ছয়ের পাতায় দেখুন

ডিএসও'র নেতৃত্বে গুজরাটে শিক্ষা বাঁচাও আন্দোলন

দেশের অন্যান্য প্রদেশের মতো গুজরাটেও শিক্ষাব্যবস্থা চূড়ান্ত সঙ্কটের সম্মুখীন। সাধারণ স্কুলগুলিতে শিক্ষার মানের দ্রুত অবনমন ঘটছে। এই অবনমন এত গভীর যে, এর ফলে এমন একটা ধারণার সৃষ্টি হয়েছে, যেন একমাত্র সেল্ফ ফিনান্সিং স্কুল-কলেজেই ভাল শিক্ষা পাওয়া সম্ভব। অর্থাৎ উন্নত মানের শিক্ষা পেতে গেলে উচ্চমূল্য দিতে হবে। সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচার শিক্ষা ব্যবসায়ীদের সুযোগ করে দিচ্ছে। সরকারও এই বেসরকারি শিক্ষা ব্যবসায়ীদের মানুষকে যথেচ্ছ শোষণের ছাড়পত্র দিয়ে দিয়েছে। শিক্ষার এই চূড়ান্ত সঙ্কটকে উপলব্ধি করেই এ আই ডি এস ও রাজ্য জুড়ে 'শিক্ষা বাঁচাও' প্রচার আন্দোলন শুরু করেছে। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা, শহর এবং জেলা জুড়ে 'শিক্ষা বাঁচাও অভিযান' নামে এক শিক্ষাযাত্রা এ আই ডি এস ও শুরু করেছে। এর প্রথম পর্বে গত ১১ এপ্রিল থেকে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত আমেদাবাদ ও ভদোদরা সংলগ্ন বিস্তৃত অংশ জুড়ে এই শিক্ষাযাত্রা চলে। আমেদাবাদে অন্য একটি প্রচার আন্দোলন ২৮ এপ্রিল থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত চলে। ২ মে ও ৩ মে বরোদা জেলা জুড়ে প্রচার চলে। সুরাটে ডি এস ও, ডি ওয়াই ও এবং সেভ এডুকেশন কমিটি ৮ মে প্রচার চালায়। এই প্রচারপর্বে অসংখ্য জায়গায় বক্তব্য রাখা হয়, সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়, পুস্তক বিক্রি এবং আন্দোলনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হয়। এর মধ্য দিয়ে অসংখ্য যোগাযোগ গড়ে ওঠে। সর্বত্রই সাধারণ মানুষ এই প্রচারে ব্যাপকভাবে সাড়া দেন। এই প্রচার যাত্রাগুলিতে অংশ নেন ডি এস ও রাজ্য কমিটির সভাপতি জয়েশ প্যাটেল, রাজ্য সম্পাদক ভাবেক রাজা, সহ-সভাপতি মুকেশ সেমওয়াল সহ অন্যান্য ছাত্রনেতা ও কর্মীবৃন্দ। এই শিক্ষাযাত্রা ব্যাপক সাফল্য লাভ করেছে। আরও বিস্তৃত আকারে এই আন্দোলনকে ছড়িয়ে দেবারও চেষ্টা হচ্ছে।

গত ১৫ মে আমেদাবাদের এইচ কে আর্টস কলেজে সেভ এডুকেশন কমিটি এক নাগরিক সভার আয়োজন করে। সভায় সভাপতিত্ব করেন, সৌরাষ্ট্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য এবং সেভ এডুকেশন কমিটির সভাপতি অধ্যাপক দেওরথ। সভায় বিভিন্ন শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, অধ্যাপক, অভিভাবক সহ সমাজের বিভিন্ন অংশের অসংখ্য মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

পার্টিকর্মীর জীবনাবসান

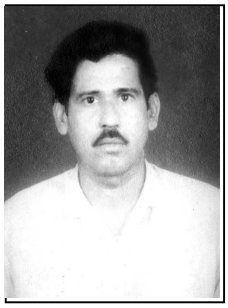

গত ৩১মে রাত্রে বাঁকুড়া বড়জোড়া থানার মালিয়াড়া অঞ্চলের মেটেলি গ্রামের মাধ্যমিক শিক্ষক, দলের কর্মী কমরেড লাবণ্য মণ্ডল হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫২ বছর। মাঝে মাঝে তিনি অসুস্থতার কারণে চিন্তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেললেও দলের কথা ও কাজের প্রশ্নে ছিলেন অবিচল। গরিব মানুষের কাছে এবং নিজ স্কুলের ও অন্যান্য স্কুলের ছাত্রদের কাছে তিনি ছিলেন খুবই প্রিয়। বহু মানুষ তাঁর কাছ থেকে নানা সহযোগিতা পেয়েছেন। তাঁর সততা ও সুন্দর ব্যবহার মানুষকে আকৃষ্ট করত। মাধ্যমিক শিক্ষক সংগঠনে যুক্ত থেকে শিক্ষা ও শিক্ষক সমস্যা সমাধানের আন্দোলনে তিনি যুক্ত থাকতেন। ৭০-এর দশকের শুরুতে দলের সাথে ছাত্র অবস্থায় তিনি যুক্ত হন। ক্রমে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার প্রতি খুবই আকৃষ্ট হন।

গত ১২ জুন তাঁর স্মরণে আয়োজিত সভায় বহু মানুষ সমবেত হন। দলীয় কর্মী ও নেতারা ছাড়াও তাঁর প্রতিকৃতিতে স্থানীয় শিক্ষক, চিকিৎসক, সঙ্গীত শিক্ষক সহ অনেকেই মাল্যদান করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমরেড তারক পাখিরা। বক্তব্য রাখেন কমরেড তারাপদ গরাই, কমরেড তুলসী সাম, কমরেড লক্ষ্মণ মণ্ডল, কমরেড জয়দেব পাল। প্রধান বক্তা ছিলেন শিক্ষা আন্দোলনের নেতা ও দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড তপন রায়চৌধুরী। ছাত্রাবস্থায় দলের সাথে যুক্ত হওয়ার পর শিক্ষকতা ও শিক্ষা আন্দোলনে বর্তমান সময় অবধি তাঁর ভূমিকার কথা তিনি উল্লেখ করেন। শিক্ষক হলধর অধিকারী ও রবি কর্মকার এবং সঙ্গীত শিক্ষক শুভেন্দু চক্রবর্তী তাঁর বহু গুণের দিক উল্লেখ করে বক্তব্য রাখেন।

পুরুলিয়া

আড়ষায় বিড়ি শ্রমিক আন্দোলনের জয়

পুরুলিয়া জেলা যখন ৫২° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় জ্বলছে, যখন মানুষ বাড়ি থেকে বার হতে পারছে না, সে সময় তাঁদের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য শতাধিক বিড়ি শ্রমিক ২০ জুন আড়ষা বিডিও অফিসে ডেপুটেশন ও ঘেরাও কর্মসূচিতে উপস্থিত হন।

সমস্ত বিড়ি শ্রমিকদের পরিচয়পত্র প্রদান, এক হাজার বিড়ি প্রতি ১০০ টাকা মজুরি, কাজের অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি, সারা বছর কাজ সুনিশ্চিত করা, প্রতিটি শ্রমিককে প্রভিডেন্ট ফান্ড আইনের আওতায় এনে পেনশন নেওয়ার অধিকার সুনিশ্চিত করা, প্রভিডেন্ট ফান্ডে শ্রমিকদের অনুদান বাধ্যতামূলক না করা, যুদ্ধকালীন তৎপরতায় পানীয় জলের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি আট দফা দাবিতে পুরুলিয়া জেলার বিড়ি শ্রমিক সংঘ আড়ষা থানা কমিটি এই ডেপুটেশনের আয়োজন করেছিল।

বিড়ি শিল্পের মালিক, কনট্রাক্টর এবং সরকারি নীতির ত্রিমুখী আক্রমণে শ্রমিকরা বিপর্যস্ত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ন্যূনতম বিড়ি মজুরি আইনকে তোয়াক্কা না করে শ্রমিকদের এক হাজার বিড়ি পিছু মাত্র ২০-২৫ টাকা মজুরি দেওয়া হচ্ছে। এই ব্যাপারে ন্যূনতম মজুরি পরিদর্শক থাকা সত্ত্বেও শ্রমিকরা আজও অবহেলিত। বিড়ি শ্রমিকদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম দপ্তর দ্বারা গঠিত বিড়ি শ্রমিক কল্যাণ সংগঠনের দেওয়া পরিচয়পত্র প্রকৃত শ্রমিকরা পাচ্ছেন না। এমতাবস্থায় ক্ষুব্ধ বিড়ি শ্রমিকরা বিডিওকে প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে ঘেরাও করে রাখেন। বিডিও শ্রমিকদের সমস্ত দাবি মেনে নেন এবং ক্যাম্প করে পরিচয়পত্র দেওয়ার দিন ঘোষণা করেন।

এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন আড়ষা থানা বিড়ি শ্রমিক সংঘের সম্পাদক অনাদি কুমার, রাজেন মাহাত, ফটিক কুমার প্রমুখ। পুরুলিয়া জেলার বিড়ি শ্রমিক সংঘের জেলা সম্পাদক কমরেড রঙ্গলাল কুমার এই শ্রমিক সমাবেশে তাঁর বক্তব্যে শ্রমিকদের সংগ্রামী ভূমিকাকে অভিনন্দন জানান।

মুর্শিদাবাদ জেলায় কমসোমলের শিক্ষাশিবির

গত ১৩-১৪ জুন রানিনগরে কিশোর কমিউনিস্ট বাহিনী কমসোমলের মুর্শিদাবাদ জেলা শিক্ষাশিবির ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হল। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৩০৬ জন প্রতিনিধি এই শিক্ষাশিবিরে অংশগ্রহণ করে। শিক্ষাশিবির পরিচালনা করেন এস ইউ সি আই দলের জেলা সম্পাদক কমরেড স্বপন ঘোষাল।

কমরেড ঘোষাল এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিপ্লবের ইতিহাস থেকে উদাহরণ তুলে ধরে দেখান, সমাজ পরিবর্তনে কিশোর-কিশোরীরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সমাজে যাঁরা বড় চরিত্রের অধিকারী হয়েছেন, তাঁরা কিশোর বয়স থেকেই মানুষের প্রতি গভীর ভালবাসা ও মমত্ববোধ থেকে সামাজিক বৈষম্য ও অন্যায়ের প্রতিকারে প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন। বড় চরিত্রের অধিকারী হতে হলে, বড় মানুষদের শ্রদ্ধা জানাতে গেলে অবশ্যই গরিব মেহনতি মানুষের পক্ষে দাঁড়িয়ে সামাজিক অন্যায়, নিপীড়নের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। বিজ্ঞান ও সমাজ পরিবর্তনের ইতিহাস ব্যাখ্যা করে তিনি দেখান সমস্ত কিছুই পরিবর্তনশীল, ফলে বর্তমান এই পুঁজিবাদী সমাজেরও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ভেঙে বুর্জোয়া মানবতাবাদী মূল্যবোধ সমাজে এনেছিল বুর্জোয়া গণতন্ত্র। বুর্জোয়া গণতন্ত্র আজ সেই চরিত্র হারিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করেছে। ফলে সে আজ পচা-গলা-নোংরা সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে শিশু-কিশোর মন বিষিয়ে দিচ্ছে। নারীপাচার, শিশুপাচার হচ্ছে, শিশুশ্রমিক বাড়ছে। মানুষের মুক্তির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ। বিজ্ঞানের সমস্ত শাখাকে সংযোজিত করে গড়ে ওঠা মানবসমাজের সর্বাধুনিক এবং বৈজ্ঞানিক দর্শন মার্কসবাদ-লেনিনবাদই পারে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সত্যিকারের আন্দোলন গড়ে তুলতে, সমাজ পরিবর্তন করতে।

দু'দিনব্যাপী এই শিক্ষাশিবিরে প্রতিনিধিরা আলোচনা ছাড়াও গান, আবৃত্তি, নাটক ও খেলাধূলা, প্যারেড, পি-টিতে অংশগ্রহণ করে। জেলায় কমসোমলের কাজ পরিচালনা করার জন্য কমরেড ওহিরুজ্জামানকে জেলা সম্পাদক করে ২৪ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়। আন্তর্জাতিক সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে শিক্ষাশিবির শেষ হয়। শিক্ষাশিবির সফল করতে রানিনগরের সর্বস্তরের মানুষ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। কমরেড স্বপন ঘোষাল দলের পক্ষ থেকে তাঁদের অভিনন্দন জানিয়েছেন।

হাবড়ায় ভ্যানচালকরা আন্দোলনে

১৪ জুন উত্তর ২৪ পরগণার হাবড়ায় ভ্যানচালক সংগ্রাম সমিতির ডাকে সহস্রাধিক ভ্যানচালক পৌরসভার ভ্যানে যাত্রীপরিবহনের নিষেধাজ্ঞার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাবড়া থানা ও পৌরসভায় ডেপুটেশন দেন। এই ডেপুটেশনে ভ্যানচালকদের যাত্রী পরিবহনের লাইসেন্স দেওয়া, ভ্যানচালকদের বিপিএল তালিকাভুক্ত করা, পুলিশি হয়রানি বন্ধ করার দাবি জানানো হয়। প্রসঙ্গত ২০০২ সালেও পৌরসভার একই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভ্যানচালক সংগ্রাম সমিতি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে পৌরসভাকে পিছু হঠতে বাধ্য করেছিল। এবারও ইতিমধ্যেই ভ্যানচালকদের যাত্রীবহন করতে বাধা দেওয়া হবে না বলে পৌরসভা বা থানা প্রাথমিক সিদ্ধান্তে বানিয়েছে।

এরপর হাবড়া মডেল হাইস্কুলে ভ্যানচালকদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন কমরেড গোপাল বিশ্বাস। সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন সংগঠনের বিদায়ী সম্পাদক পতিতপাবন মণ্ডল। সম্মেলনে তুষার ঘোষ ও বিভিন্ন ভ্যান স্ট্যান্ডের প্রতিনিধিরা তাদের জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে বক্তব্য রাখেন। তুষার ঘোষকে সম্পাদক করে সত্তর জনের এক শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়।

সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধের দাবিতে সিউড়ী থানায় বিক্ষোভ

সিউড়ীর হুসনাবাদ গ্রামের সদ্য বিধবা এক মহিলা এক দুষ্কৃতীর কুপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় উক্ত দুষ্কৃতী সদলবলে বোমা নিয়ে ঐ মহিলার বাড়িতে হামলা চালায় এবং প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। উক্ত দুষ্কৃতীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার, মহিলার নিরাপত্তা ও গ্রামে সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করার দাবি জানিয়ে গত ১৫ই জুন এস ইউ সি আই সিউড়ী লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে সিউড়ী থানায় বিক্ষোভ দেখানো হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড মানস সিংহ। বিক্ষোভসভা থেকে এক প্রতিনিধিদল সিউড়ী থানার আই সি'র কাছে দাবিপত্র জমা দেয়। তিনি দাবিপূরণের আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ কর্মসূচি শেষ হয়।

ভারতবর্ষের ৪৯ শতাংশ কৃষকের ঘাড়েই ঋণের বোঝা

কেন্দ্রীয় সরকারি জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থা (NSSO)-র সাম্প্রতিক একটি রিপোর্টে এদেশের কৃষকদের ভয়াবহ ঋণগ্রস্ততার চিত্রটি প্রকাশিত হয়েছে। রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষের মোট কৃষকসংখ্যার প্রায় অর্ধাংশই (৪৮.৬ শতাংশ) চূড়ান্তভাবে ঋণগ্রস্ত। রাজ্যভিত্তিক যে হিসাব রিপোর্টটি দিয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে চূড়ান্ত দ্রারিদ্র অধ্যুষিত বিহার বা খরাপীড়িত রাজস্থান রাজ্যে নয়, কৃষিউৎপাদনে অথবা শিল্প বিনিয়োগের দিক দিয়ে যে রাজ্যগুলি এগিয়ে আছে, সেই রাজ্যগুলিতেই ঋণভারে জর্জরিত কৃষকের সংখ্যা বেশি। এ ব্যাপারে সবচেয়ে এগিয়ে আছে অন্ধ্রপ্রদেশ। এ রাজ্যের ৮২ শতাংশ কৃষকই দেনার দায়ে ডুবে আছে; অথচ খাদ্যশস্য উৎপাদনে সারা দেশের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশের স্থান পঞ্চম। এমনকী কৃষিতে দেশের সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী রাজ্য পাঞ্জাবেও ঋণগ্রস্ত কৃষকের সংখ্যা ৬৫.৪ শতাংশ। '৯০-এর দশকে সংস্কার পর্ব শুরু হওয়ার পর থেকে যে তামিলনাড়ু রাজ্যটি দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছে, সেই রাজ্যেরও শতকরা প্রায় ৭৫ জন কৃষক চূড়ান্ত ঋণগ্রস্ত।

রিপোর্টটিতে আরও দেখা যাচ্ছে, কৃষকরা ঋণ নিয়েছেন মূলত চাষবাসের চলতি-খরচ মেটাতে ; অর্থাৎ বীজ, সার, কীটনাশক কিনতে বা জলসেচের ব্যবস্থা করতে এই টাকা তাঁরা ধার করেছেন মূলত সুদখোর-মহাজনদের কাছ থেকে, সরকারি ঋণদানকারী সংস্থা বা ব্যাঙ্ক থেকে নয়।

সুতরাং রিপোর্ট থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, যখন দেশের জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির হার এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমাগত ঊর্ধ্বগামী হচ্ছে, তখন কৃষকদের উপর তার কোনও শুভ প্রভাব তো পড়ছেই না, বরং তাঁদের অবস্থা ক্রমাগত নীচের দিকে নেমে চলেছে। সরকারী ভাষ্য অনুযায়ী উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে যেখানে তাঁদের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটার কথা, তা না ঘটে, বিপরীতে চাষের খরচ জোগাড় করতে গিয়েই অসংখ্য ছোট ও মধ্যচাষী সুদখোর মহাজনদের কবলে পড়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছেন। এমনকী বিপুল পরিমাণে ফসল উৎপাদন করা সত্ত্বেও চাষী তার ঋণ শোধ করতে পারছে না; প্রায় প্রতিদিনই কৃষিতে উন্নত এই রাজ্যগুলি থেকে কৃষকদের আত্মহত্যার খবর পাওয়া যাচ্ছে।

কেন এমন হচ্ছে, কেন বর্ধিত উৎপাদনের কোনও সুফলই সাধারণ কৃষক পাচ্ছে না — এ প্রশ্নের উত্তর পেতে গেলে দেশের কৃষি ব্যবস্থা ও তার উৎপাদন কাঠামোর দিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে।

ভারতবর্ষের কৃষি কাঠামোর দিকে তাকালে একথা বুঝতে অসুবিধা হয়না যে, স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে পুঁজিবাদী অর্থনীতির পথেই এ দেশের কৃষি বিকশিত হয়েছে। এই শোষণমূলক পুঁজিবাদী অর্থনীতির পথেই ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে এক শ্রেণীর ধনী কৃষকগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে যাদের হাতে কৃষিজমির প্রধান অংশটাই কেন্দ্রীভূত হয়েছে এবং ক্রমাগত কৃষিজমি হাতছাড়া হতে হতে গ্রামীণ জনসাধারণের বেশিরভাগ অংশ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকে অথবা ভূমিহীন খেতমজুরে পরিণত হয়েছে। ভারতবর্ষে কৃষিপণ্য যা উৎপাদিত হয়, পুঁজিবাদী অর্থনীতির নিয়ম অনুসারে তা উৎপাদন করা হয় জাতীয় বাজারের চাহিদা পূরণ করতে এবং তার দামও নির্ধারিত হয় জাতীয় বাজারের নিয়ম মেনে।

পুঁজিবাদের নিয়মে ধনী কৃষকগোষ্ঠীর হাতে একদিকে যেমন জমি ও অধিকাংশ সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়েছে, তেমনই কৃষির উন্নয়নে নানা সময়ে দেওয়া সরকারি সাহায্যের সিংহভাগ এরাই ভোগ করেছে। খোদ সরকারি রিপোর্টেই বলা হয়েছে যে, 'সবুজ বিপ্লবে'র সময়ে বীজ, সার, সেচের জল বা কীটনাশকের ক্ষেত্রে এরাই সর্বাধিক সুবিধা পেয়েছে। এইভাবে সরকারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতে, বিপুল পরিমাণ মুনাফা কুক্ষিগত করেছে এই গ্রামীণ ধনিকশ্রেণী। সঞ্চিত এই অর্থ পুঁজি হিসাবে বিনিয়োগ করে আরও মুনাফা অর্জন করতে এরা কৃষিক্ষেত্রকেই বেছে নিয়েছে।

অন্যদিকে, ভারতবর্ষের বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজিমালিকরা কৃষিক্ষেত্র সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করেছে। শিল্পসহায়ক ক্ষেত্র হিসাবে না দেখে কৃষিকে তারা স্বতন্ত্র একটি শিল্প হিসাবে গণ্য করতে শুরু করেছে এবং এই তীব্র বাজার সঙ্কটের যুগে, কৃষিতে পুঁজি বিনিয়োগ করে এই ক্ষেত্রটি থেকে বিপুল মুনাফা অর্জনের পরিকল্পনা করছে; গড়ে তুলতে চাইছে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ সহ নানাবিধ কৃষি ও কৃষি-নির্ভর শিল্প।

এরই সাথে যুক্ত হয়েছে বহুজাতিক কোম্পানিগুলি। বিশ্বায়নের সুযোগ নিয়ে মুনাফা লুঠ করার উদ্দেশ্যে এরাও ভারতবর্ষের কৃষিক্ষেত্রে লোভের থাবা বসাতে চাইছে। এদেশের কৃষিপণ্যকে যাতে অবাধে আন্তর্জাতিক বাজারের পণ্যে পরিণত করা যায় সেজন্য এরা কেন্দ্রীয় সরকার ও বিভিন্ন রাজ্য সরকারগুলিকে কৃষিক্ষেত্রে 'সংস্কার' কার্যক্রম গ্রহণ করার পরামর্শ দিচ্ছে, নানাবিধ প্রস্তাব দিচ্ছে। এইসব প্রস্তাবের মূল লক্ষ্য হল, সমস্ত ধরনের সরকারি বিধিনিষেধ তুলে নিতে সরকারকে বাধ্য করে কৃষি-সংশ্লিষ্ট পণ্যগুলির অবাধ বেচাকেনা ও আমদানি-রপ্তানির বন্দোবস্ত করা এবং ছোট ও মধ্যচাষী সহ এদেশের গরিব-মধ্যবিত্ত মানুষের জন্য সরকারি সাহায্য বা সুযোগসুবিধার যেটুকু অবশিষ্ট আছে, সেটুকুও বন্ধ করে দিতে সরকারকে বাধ্য করা।

আবার দেখা যাচ্ছে, এদেশের গ্রামীণ পুঁজি ও বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজির পরস্পরের স্বার্থের মধ্যে যত দ্বন্দ্বই থাক না কেন, এরা উভয়েই বিশ্বায়নের তথা মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রবল পৃষ্ঠপোষক। বিশ্বায়িত অর্থনীতির সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বিদেশি পুঁজির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে বহুজাতিক কোম্পানিগুলির সাথে যৌথ উদ্যোগ গড়ে তুলে এরা কৃষিক্ষেত্র থেকে মুনাফা লোটার ছক কষছে। ফলে ফিকি, অ্যাসোচেম বা সি আই আই-এর মতো শিল্প পুঁজির সংগঠনের সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাব-হরিয়ানার ধনী কৃষক গোষ্ঠী বা শরদ যোশীর 'খেতকারী সংগঠন'ও কৃষিক্ষেত্রে সংস্কার কার্যসূচিকে জোরালোভাবে সমর্থন করছে।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে যখন যে রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠী কেন্দ্রীয় সরকারি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে তারা প্রত্যেকেই ভারতবর্ষের গ্রামীণ ও শিল্প পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষা করে এসেছে। সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে গ্যাট চুক্তি পরবর্তী বিশ্বায়নের বর্তমান পরিস্থিতিতেও কেন্দ্রীয় সরকারি ক্ষমতার দখলদার রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিটিই দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের স্বার্থে এদের পেশ করা প্রতিটি প্রস্তাব 'সংস্কার কর্মসূচি'র নামে বিনা প্রতিবাদে পালন করে চলেছে। ফলে পুঁজিমালিকদের জন্য একদিকে যেমন অবাধ মুনাফার ক্ষেত্র উন্মুক্ত হয়ে চলেছে, তেমনই অন্যদিকে মধ্য ও ক্ষুদ্র চাষী সহ সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের উপর বেড়ে চলেছে শোষণের মাত্রা।

খোলাবাজার অর্থনীতির সূচনার এক দশকের মধ্যে দেশি-বিদেশি পুঁজির মিলনে কৃষি-সম্পর্কিত অসংখ্য যৌথ উদ্যোগ এদেশে গড়ে উঠেছে। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প থেকে শুরু করে ফল-ফুল-কৃষিভিত্তিক শিল্প, বীজ, এমনকী সারের ক্ষেত্রেও যৌথ উদ্যোগ তৈরি হয়েছে। ভারতের কৃষিনির্ভর শিল্পে বিপুল পরিমাণে দেশি-বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগ করে দিতে পুঁজিমালিকদের সুপারিশ অনুযায়ী সরকার আমদানি-রপ্তানি অবাধ করে দিয়েছে, জমির ঊর্ধ্বসীমা আইন তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে, খাদ্যশস্য সহ সারের মতো কৃষি-উপকরণের উপর থেকে ধীরে ধীরে ভর্তুকি তুলে নিচ্ছে। দেশি-বিদেশি যৌথ উদ্যোগ এমনকী বীজের ব্যবসায় পর্যন্ত নেমে পড়েছে, যার ফল হয়েছে মারাত্মক।

প্রথাগত বীজের তুলনায় উচ্চ ফলনশীল সঙ্কর বীজ বিক্রিতে যেহেতু মুনাফার হার অত্যন্ত বেশি, তাই একদিকে দেশীয় বৃহৎ বীজ ব্যবসায়ীরা, অন্যদিকে বহুজাতিক কোম্পানিগুলির সঙ্গে মিলে ভারতীয় পুঁজিপতিরা যেসব যৌথ বীজ উৎপাদন ও বিপণন সংস্থা গড়ে তুলেছে, তারা একযোগে প্রথাগত বীজের ব্যবহার বন্ধ করে সঙ্কর বীজ ব্যবহারে চাষীদের নানাভাবে প্রলুব্ধ করছে। বস্তুতপক্ষে কৃষিপণ্যের বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকতে গেলে চাষীর আজ আর সঙ্কর জাতের উচ্চফলনশীল বীজ ব্যবহার না করে উপায় নেই।

আবার সঙ্কর বীজ ব্যবহার করলে ফসল উৎপাদনে অনেক বেশি পরিমাণে সার এবং কীটনাশক ওষুধের প্রয়োজন হয়। সরকারের অবাধ আমদানি-রপ্তানি নীতির দরুণ বহুজাতিক সার ও কীটনাশক উৎপাদক সংস্থার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে দেশীয় কোম্পানিগুলির সবক'টিই প্রায় উঠে গেছে। ফলে এগুলির জন্য এদেশের কৃষকদের বহুজাতিক কোম্পানিগুলিরই দ্বারস্থ হতে হয়। সুযোগ পেয়ে সারের দাম বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে সার কোম্পানিগুলি। নয়া অর্থনৈতিক নীতি চালু হওয়ার পর থেকে সারের দাম ২২৫ থেকে ২৭৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর উপর সরকার সারের উপর থেকে ক্রমে ক্রমে ভর্তুকি তুলে নিচ্ছে। ফলে চড়া দামে সার কিনতে ছোট চাষীকে ৬০ থেকে ১২০ শতাংশ সুদে ঋণ করতে হচ্ছে। কীটনাশক ওষুধেরও আকাশছোঁয়া দাম। সব মিলিয়ে মধ্য ও ছোট চাষীর পক্ষে চাষের এই বিপুল খরচ বহন করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গরিব চাষীর উৎপাদিত ফসলের অভাবী বিক্রির সমস্যা। উৎপন্ন ফসল সংরক্ষণ করার মতো পরিস্থিতি বা আর্থিক সামর্থ্য কোনটাই মধ্য ও ক্ষুদ্র চাষীদের নেই। গুদাম ঘর বা যানবাহনের ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয়। তাছাড়া বিপুল অর্থ ঋণ করে চাষের কাজ চালানোর পর দেনা শোধ করার তাড়ায় বেশিদিন অপেক্ষা করাও এদের পক্ষে সম্ভব নয়। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে ফড়ে বা ব্যবসায়ীরা যথেচ্ছ কম দামে এদের কাছ থেকে ফসল কিনে নিয়ে লাভের পরিমাণ প্রচুর বাড়িয়ে তোলে। দেশি-বিদেশি পুঁজির স্বার্থে সরকার যে অবাধ রপ্তানি-আমদানির নীতি গ্রহণ করেছে, এর ফলে তার সুফল তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সাধারণ কৃষক ভোগ করেনি, সবটাই পুঁজিমালিকদের পক্ষে গেছে। অন্ধ্রপ্রদেশের ঋণগ্রস্ত তুলাচাষীরা এর জ্বলন্ত উদাহরণ। তুলা রপ্তানির উপর সমস্ত বিধিনিষেধ তুলে দেবার পর তুলা রপ্তানি ৪১০ শতাংশ বেড়ে যায়। অথচ তুলা উৎপাদনের পরিমাণ এ সময় বিশেষ একটা বাড়েনি। বাজারের সূত্র অনুযায়ী এই পরিস্থিতিতে তুলার দাম বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে চাষীর বেশি দাম পাওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে তুলা কর্পোরেশনগুলি বাজারে তাদের একচেটিয়া আধিপত্য চালিয়ে চাষীদের কম দামে তুলা বেচতে বাধ্য করেছে এবং কর্পোরেশনগুলি সেই তুলা বেশি দামে বিক্রি করে প্রভূত মুনাফা করেছে। অভাবী বিক্রি ঠেকাতে সরকারের পক্ষ থেকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ঘোষণা করে চাষীদের কাছ থেকে সরাসরি ফসল কিনে নেওয়ার নিয়ম চালু আছে। কিন্তু বাস্তবে অকর্মণ্য প্রশাসনের গাফিলতির কারণে ও সরকারি নজরদারির অভাবে চাষীরা সরকারের ভারপ্রাপ্ত সংস্থার কাছে তাদের ফসল বিক্রি করার সুযোগ পায় না। এর উপরে আছে চূড়ান্ত দুর্নীতি। ফলে সরকারি সহায়ক মূল্যের যাবতীয় সুযোগ লুটে নেয় কিছু অসাধু ব্যবসায়ী ও সরকারি রাজনৈতিক দল পোষিত কৃষক সমিতিগুলি। সাধারণ চাষী যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই পড়ে থাকে।

এইভাবে বিশ্বায়নের অর্থনীতির সুযোগ নিয়ে সরকারের প্রত্যক্ষ সহায়তায় ভারতের কৃষিক্ষেত্রে দেশি-বিদেশি পুঁজির শোষণের থাবা ক্রমাগত আরও দৃঢ় হচ্ছে এবং সেই শোষণের ফাঁদে আটকা পড়ে এদেশের মধ্য ও ক্ষুদ্র চাষীদের জীবন সঙ্কটগ্রস্ত হয়ে উঠছে। ক্রমাগত আরও বেশি করে তারা ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ছে। ফলে একদিকে যেমন কৃষি উৎপাদন বিপুল হারে বাড়ছে, অন্যদিকে যে কৃষকশ্রেণী মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সেই ফসল উৎপাদন করছে, তারা ক্রমাগত ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ে বাঁচার কোনও পথ খুঁজে না পেয়ে শেষে আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছে।

এই দুর্বিষহ অবস্থার অবসান ঘটাতে চাষীদের স্বার্থরক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সহ রাজ্য সরকারগুলির উপর তীব্র চাপ সৃষ্টি করা দরকার। এর জন্য চাষীদের সঠিক রাজনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উচ্ছেদ না ঘটিয়ে যেহেতু কৃষক-শ্রমিক সহ সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের জীবনের মূল সমস্যাগুলির সম্পূর্ণ সমাধান সম্ভব নয়, তাই সরকার- বিরোধী আন্দোলনগুলিকে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিপূরক করে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে, যাতে শোষিত অত্যাচারিত কৃষকসমাজ সহ সাধারণ মানুষ সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লব সফল করার লক্ষ্যে সচেতনভাবে এগিয়ে আসে এবং পুঁজিপতিশ্রেণীর শোষণের জাল কেটে বেরিয়ে শ্রমিক-কৃষকের স্বার্থরক্ষাকারী সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে।

এ আই কে কে এম এস-এর নেতৃত্বে

পুরুলিয়ার কাশীপুর ব্লকে ডেপুটেশন

পানীয় জল, ক্ষেতমজুরদের সারা বছরের কাজ, তাদের পরিচয়পত্র প্রদান, উপযুক্ত মজুরি সুনিশ্চিত করা, প্রকৃত গরিবদের বিপিএল কার্ড সরবরাহ, গরিব চাষীদের বিনামূল্যে বীজ, সার ও কীটনাশক সরবরাহ, সেচের ব্যবস্থা, পঞ্চায়েতের বর্ধিত ট্যাক্স প্রত্যাহার এবং মদের ঢালাও লাইসেন্স দানের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার সহ ১২ দফা দাবির ভিত্তিতে গত ১৪ জুন সারা ভারত কৃষক ও ক্ষেতমজুর সংগঠন, কাশীপুর থানা কমিটির নেতৃত্বে পুরুলিয়ার কাশীপুর ব্লকে এক ডেপুটেশন দেওয়া হয়। লক্ষণীয় যে নিজেদের দৈনিক মজুরির কাজ ত্যাগ করে এবং ভয়াবহ তাপপ্রবাহ উপেক্ষা করে সাধারণ ক্ষেতমজুর ও গরিব মানুষ বিরাট সংখ্যায় মিছিলে সামিল হন।

ব্লক অফিসের সামনে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই দলের সোনাইজুড়ি লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড কালিপদ মাহাত এবং এ আই কে কে এম এস-এর জেলা কমিটির সদস্য কমরেড মোহন মাহাত ও সীতারাম মাহাত।

মোহন মাহাত-র নেতৃত্বে সাত জনের এক প্রতিনিধি দল যুগ্ম বি ডিও-র কাছে স্মারকলিপি পেশ করেন। যুগ্ম বিডিও দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে দাবিপত্র ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেবার আশ্বাস দেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়ন

সোভিয়েটকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল হিটলার

(মহান নেতা স্ট্যালিনের আহ্বানে উজ্জীবিত হয়ে সোভিয়েট জনগণ ও লালফৌজ সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন, আমেরিকা, ফ্রান্সের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতে বলীয়ান দুর্ধর্ষ জার্মান ফ্যাসিস্টবাহিনীকে শেষপর্যন্ত ঠিক কীসের জোরে এবং কেমনভাবে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছিল, শুধু সোভিয়েট ভূখণ্ড নয় — ইউরোপের বিস্তীর্ণ এলাকাগুলিকেও ফ্যাসিস্ট-দখলমুক্ত করেছিল, সেদিনের ভয়ঙ্কর মুহূর্তেও জনগণের প্রতি নেতার আস্থা ও বিশ্বাসকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল — সেই ইতিহাস আমাদের জানা দরকার। সোভিয়েটের জনগণ সমাজতন্ত্র চায়নি, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভাঙতে চেয়েছে, সেজন্যই সমাজতন্ত্র ভেঙেছে — এই সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিবিপ্লবী প্রচারের মোকাবিলায় আমাদের জানা দরকার কীভাবে সোভিয়েট জনগণ সমাজতন্ত্র রক্ষার জন্য সর্বস্ব পণ করে লড়েছে। শোষিত জনগণ এবং সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে লিপ্ত বিপ্লবীদের কাছে এ এক অমূল্য ইতিহাস — যা না জানলে সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে ধারণাই অপূর্ণ থেকে যাবে, যা জানলে শোষণমুক্তির লড়াই আরও ধারালো হবে। এই লক্ষ্য থেকেই সেদিনের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত আকারে ধারাবাহিকভাবে আমরা প্রকাশ করছি। — সম্পাদক, গণদাবী)

চতুর্থ পর্ব

বৃটেনকে ধ্বংস ও দখল করা নয়, ভয়ঙ্কর আক্রমণের চাপ সৃষ্টি করে বৃটেনকে জার্মানির শর্তে সন্ধি করানোই ছিল ফ্যাসিস্ট জার্মানির লক্ষ্য। তার লক্ষ্যটি ছিল বনেদী সাম্রাজ্যবাদী দেশ বৃটেন ও ফ্রান্সকে হটিয়ে নিজে বিশ্ববাজার দখল করা ও সাম্রাজ্যবাদের শিরোমণির স্থান অধিকার করা। বাজার নিয়ে দুই সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের দ্বন্দ্বই ছিল যুদ্ধের কারণ। তাই সোভিয়েটের বিরুদ্ধতার প্রশ্নে সম মনোভাব থাকলেও বৃটেনের পক্ষে জার্মানির শ্রেষ্ঠত্ব মেনে জার্মানির পক্ষে যোগ দেওয়া সম্ভব ছিল না। আবার রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মানিকে সে কাজে লাগাতেও চাইছিল। কিন্তু বিশ্ববাজারের ওপর নিজস্ব সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য ছেড়ে দেওয়ায় সে রাজি ছিল না।

পরাস্ত করা নয়, সোভিয়েটকে নিশ্চিহ্ন করাই হিটলারের পরিকল্পনা

সোভিয়েট সম্পর্কে কিন্তু ফ্যাসিস্টদের এই দৃষ্টিভঙ্গি নয়। সেক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্ন। ১৯৪১-এর ৩০ মার্চ জার্মান জেনারেলদের সামনে বক্তৃতা দেওয়ার সময় সোভিয়েট আক্রমণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে হিটলার বললেন, রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ''চলবে ধ্বংসের জন্য; আমরা যদি ব্যাপারটাকে এভাবে না দেখি তাহলে শত্রুকে পুরোপুরি পরাস্ত করলেও ৩০ বছর বাদে আবার কমিউনিস্ট বিপদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। আমরা যুদ্ধ চালাচ্ছি নিজের শত্রুকে টিনের বাক্সে সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে নয়।'' (এফ গলডের। সামরিক ডায়েরি, খণ্ড ২)। সোভিয়েটের বিরুদ্ধে ফ্যাসিস্ট জার্মানির পরিকল্পনা ছিল সোভিয়েট ইউনিয়নকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা, এবং সোভিয়েটের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন জাতিকে জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের দাস বানানো, যেমন করে তারা ইতিমধ্যেই ইহুদি সহ বিভিন্ন অ-জার্মান জাতিগোষ্ঠীর লক্ষ লক্ষ মানুষকে দাসশ্রমিক হিসেবে প্রায় অনাহারে রেখে তাদেরকে জার্মান যুদ্ধাস্ত্র কারখানায় খাটতে বাধ্য করছে। নাৎসি জেনারেলদের অপর এক অধিবেশনে হিটলার স্পষ্ট করে সেকথা জানিয়েও দিয়েছিলেন; বলেছিলেন, — ''রুশ সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করা এবং লেনিনগ্রাদ, মস্কো ও ককেসাস দখল করাই আমাদের কাছে যথেষ্ট নয়; পৃথিবীর বুক থেকে এই দেশটিকে আমাদের ধ্বংস করে দিতে হবে, তার জনগণকেও ধ্বংস করে দিতে হবে।'' (ন্যুরেমবুর্গ মোকদ্দমা, খণ্ড-২)

হিটলার তাঁর সেনাপতিমণ্ডলীকে নির্দেশ দিলেন, ''রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে কোন বীরধর্মের স্থান নেই। এটা মতাদর্শের যুদ্ধ, জাতিগত বৈষম্যের যুদ্ধ, এবং সেজন্যই এ যুদ্ধকে এমন নিষ্ঠুরতা ও বিরামহীন নির্মমতার সঙ্গে চালাতে হবে — যা ইতিপূর্বে কেউ দেখে নি। সমস্ত অফিসারদের তাদের পুরানো ধ্যানধারণা বিসর্জন দিতে হবে। আমি জানি, আপনারা যাঁরা সেনাধ্যক্ষ তাঁদের পক্ষে এমন পন্থায় যুদ্ধ চালানোর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা কঠিন। কিন্তু আমি পরিষ্কারভাবেই বলছি যে, আমার আদেশ নির্দ্বিধায় কার্যকরী করতে হবে। ...রুশ কমিশাররা এমন একটি আদর্শের বাহক যা জাতীয় সমাজতন্ত্রের (নাৎসিবাদের) সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। সুতরাং এই কমিশারদের একেবারে শেষ করে দিতে হবে। যেসব জার্মান সেনারা আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করে অপরাধী হবে — তাদের ক্ষমা করে দেওয়া হবে।'' (এ ডিক্সনারী অফ ইন্টারন্যাশনাল এ্যাফেয়ার্স, হিয়ামসন, লণ্ডন, ১৯৪৬) হিটলার আরও বললেন, ''জার্মান জনগণের নিরাপত্তা রক্ষার জন্যই আমাদের এই অভিযান। এর অঙ্গ হিসেবে এই দেশটির সমগ্র জনসমষ্টিকে সমূলে ধ্বংস করতে হবে। নিশ্চিহ্নকরণের কলাকৌশল আমাদের আরও উন্নত করতে হবে।'' (দ্য সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার, ডেবোরিন, মস্কো, ১৯৬৪)।

সোভিয়েটের শহরগুলো ধ্বংসেরও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হল। জার্মান জেনারেল স্টাফের একটি সরকারি দলিলে বলা হয়েছে, ''ফুয়েরার সিদ্ধান্ত করেছেন যে, পিটার্সবুর্গ (লেনিনগ্রাদ) শহরকে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। রাশিয়ার পরাজয়ের পর এই ঘনবসতিপূর্ণ নগরীকে জিইয়ে রাখার আর কোন প্রয়োজন হবে না।''

জার্মান ফ্যাসিস্ট বাহিনীর মধ্যে এমনভাবেই কমিউনিস্ট বিদ্বেষ এবং বিশেষ করে সোভিয়েট বিদ্বেষ প্রথম থেকে সংক্রামিত করা হয়েছিল। নির্মমভাবে জার্মান কমিউনিস্টদের হত্যা করেই হিটলার ক্ষমতায় বসেছিলেন এবং সুপরিকল্পিতভাবে ব্যাপক প্রচার চালিয়ে জার্মান জনসাধারণের একটা বড় অংশের মগজ ধোলাই করে সোভিয়েট বিদ্বেষের বিষ তীব্রভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ফলে অন্যান্য দেশ দখলের ক্ষেত্রে ফ্যাসিস্টরা কেবল সাম্রাজ্যবাদী হানাদারি চালালেও সোভিয়েটের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধের প্রস্তুতি ছিল ভাবাদর্শগত দিক থেকেও। নাৎসি উত্থানের প্রথম দিনটি থেকেই নাৎসিরা সাধারণ জার্মান জনগণকে বুঝিয়েছিল যে, জার্মানরা খাঁটি আর্যবংশ জাত এবং সেজন্য বিশ্বশ্রেষ্ঠ জাতি। অতএব বিশ্বের যাবতীয় সম্পদ কেবল জার্মানদেরই ভোগের অধিকার। অন্য সমস্ত জাতি জার্মানদের দাস হিসেবেই বাঁচবে, নইলে তাদের বেঁচে থাকবারও অধিকার নেই। নাৎসি বাহিনীর এই মতাদর্শ দ্বারা জার্মান জনগণ যথেষ্ট প্রভাবিতও হয়েছিল। ১৯৪৫-এর ১৩ জুন 'ডাই ফোক্স জাইট্যুং' সংবাদপত্রে প্রকাশিত জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক প্রচারিত একটি আবেদনপত্র থেকে জানা যায়, ''...বহু লক্ষ জার্মান জনগণ নাৎসি বাগাড়ম্বরের বেড়াজালে বন্দি হয়ে পড়েছিলেন; পাশবিক জাতি-তত্ত্ব, 'জীবনের জন্য সংগ্রামের' তত্ত্বের বিষ জনগণের মনপ্রাণকে বিষাক্ত করে দিয়েছিল। ...ব্যাপক জনসাধারণ তাদের সাধারণ সততা ও ন্যায়বোধ পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছিল এবং হিটলার যখন তাদের প্রতিশ্রুতি দিল যে, যুদ্ধ ও লুণ্ঠনের দ্বারা অন্যান্য জাতির মুখের অন্ন কেড়ে এনে তাদের উদরপূর্তি করা হবে, তখন তারা তাকে অন্ধের মত অনুসরণ করেছিল।'' (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস — ভিক্টর মাৎসুলেনকো)। এই তীব্র জাতি-বিদ্বেষ ও বিজাতীয় ঘৃণার সঙ্গে কমিউনিস্ট বিদ্বেষকে যুক্ত করে প্রচার করা হয়েছিল যে, কমিউনিস্টরা বিশ্বসভ্যতার ঘৃণ্য শত্রু, এদের বেঁচে থাকবারও অধিকার নেই; এদের সমূলে ধ্বংস করতে হবে, হত্যা করতে হবে।

কমিউনিস্ট মতাদর্শভিত্তিক নতুন সভ্যতা সোভিয়েট সমাজতন্ত্রকে নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনা নিয়ে জার্মান ফ্যাসিস্ট ঝটিকা বাহিনী সোভিয়েট সীমান্তে প্রস্তুত হল ঝাঁপিয়ে পড়ার লক্ষ্যে। ইতিমধ্যে ১৯৪১ সালের প্রথমার্ধে অর্থাৎ আক্রমণ শুরু করার ঠিক আগের ছ-মাসে সোভিয়েটের পশ্চিম সীমান্তের আকাশসীমা তারা ৩২৪ বার লঙ্ঘন করে উস্কানি সৃষ্টির চেষ্টা করেছে যাতে সোভিয়েট নেতৃত্ব ফ্যাসিস্ট বাহিনীকে আগে আক্রমণ করে বসে। তাহলে, সোভিয়েটই আক্রমণকারী এবং তারাই আগে জার্মানদের আক্রমণ করেছে বলে বিশ্বময় প্রচার চালিয়ে সোভিয়েট আক্রমণের একটা যুৎসই অজুহাত দেখানো যাবে। কিন্তু সোভিয়েট সেই প্ররোচনার ফাঁদে পা দেয়নি। যুদ্ধপূর্ব ১১ মাসের মধ্যে সোভিয়েট সীমান্তরক্ষীরা প্রায় পাঁচ হাজার জার্মান গুপ্তচরকে আটক করেছিল; তবু সীমান্তের জার্মান সেনাবাহিনীর উপর সোভিয়েট কোন আক্রমণ চালায়নি।

সংঘবদ্ধ প্রতিবিপ্লবী ইউরোপ সর্বশক্তি নিয়ে সোভিয়েট সীমান্তে

বৃটেন বাদে প্রায় সমগ্র ইউরোপ তখন জার্মান বাহিনীর করতলগত। তারা যেসব দেশ দখল করেছিল, তাদের সমগ্র অর্থনীতিকেও জার্মান সমরাস্ত্র নির্মাণের কাজে লাগানো হয়েছিল। পরাজিত দেশগুলির সমগ্র অর্থনীতি, তাদের সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন জ্বালানি তেল, ইস্পাত-কয়লা-খাদ্য-কাঁচামাল সবকিছুই তখন জার্মান বাহিনী যুদ্ধের কাজে লাগাচ্ছিল। এছাড়া ছিল তাদের সুদৃঢ় ফ্যাসিস্ট জোট, যাতে জার্মানি ছাড়াও অন্তর্ভুক্ত ছিল জাপান, ইতালি, ফিনল্যাণ্ড, হাঙ্গেরি ও রুমানিয়া। জাপান ছাড়া সব রাষ্ট্রই তাদের সেরা বাহিনী নিয়ে অবস্থান করছিল সোভিয়েট সীমান্তে। এই জোট- বাহিনীকে সাহায্য করতে ফ্রান্স ও স্পেন থেকে এসেছিল অভিযাত্রী ফ্যাসিস্ট দল। পশ্চিমে লড়াইয়ের অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ এই বিশাল বাহিনী জার্মান হাইকমান্ডের আদেশের অপেক্ষা করছিল, যাতে আদেশ পাওয়ামাত্র তারা সোভিয়েটের সামরিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলির উপর আকস্মিক আঘাত হেনে দ্রুত দখল করে নিতে পারে। ১৯৪০-এর ১৮ ডিসেম্বর হিটলার সোভিয়েটবিরোধী অভিযানের জন্য যে ২১ নং নির্দেশিকায় স্বাক্ষর করেন তা 'বার্বারোসা' পরিকল্পনা নামে খ্যাত। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন। হিটলার হিসেব করে নিয়েছিলেন যে, ১৯৪১-এর ২২ জুন শুরু হবে ঝটিকা আক্রমণ; সেই ভয়ঙ্কর আক্রমণের সাহায্যে ১ অক্টোবরের মধ্যে যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে। অর্থাৎ মাস তিনেকের মধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়নকে খতম করে দেওয়া যাবে। (সূত্র ঃ কে রেইনগার্ডট। মস্কোর উপকণ্ঠে পট-পরিবর্তন)।

সোভিয়েট আক্রান্ত

১৯৪১-এর ২২ জুন, রাত ৪টে। ২২ মাস আগে সোভিয়েট ও জার্মানির মধ্যে সম্পাদিত ১০ বছরের অনাক্রমণ চুক্তিকে পদদলিত করে হিটলারের ১৭০ ডিভিশনের বিশাল ঝটিকা বাহিনী দু-হাজার মাইল দীর্ঘ সোভিয়েট সীমান্ত জুড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পৃথিবীর ইতিহাসে এটি দীর্ঘতম রণক্ষেত্র। ভারতবর্ষের মানচিত্র খুলে দেখলে কলকাতা থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত একখানা ফ্রন্ট — একসঙ্গে আক্রমণ। উত্তরে — ফিনল্যাণ্ড থেকে লেনিনগ্রাদ ও উত্তর মেরু-বন্দর মুরমান্স্কের দিকে, মধ্যভাগে — পোল্যাণ্ড থেকে রাজধানী মস্কোর দিকে, দক্ষিণে — রুমানিয়া থেকে কিয়েভ ও ওডেসার দিকে। ত্রিশূলের ফলার মত আক্রমণ শুরু হল। হাজার হাজার বিমান বোমা বর্ষণ করতে করতে উড়ে চলল এবং হাজার হাজার ট্যাঙ্ক সীমান্ত বিধ্বস্ত করে এগিয়ে চলল; তাদের পিছনে মোটরবাহিত লক্ষ লক্ষ সেনা। হিটলার দাবি করলেন, ইতিহাসে এতবড় সামরিক অভিযান আর কখনও হয়নি। হিটলার নির্দেশ জারি করলেন — এক সপ্তাহের মধ্যে কিয়েভ ও স্মোলেন্স্ক দখল কর, এবং এক মাসের মধ্যে মস্কো এবং লেনিনগ্রাদ।

সোভিয়েটের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করার চারঘণ্টা পর ঐ ২২ জুনেই জার্মান জনগণের উদ্দেশে হিটলারের ঘোষণা বেতার মারফৎ পাঠ করে শোনানো হল। এই ঘোষণায় হিটলার যথারীতি সোভিয়েটের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করে বললেন যে, জার্মানি কখনো রাশিয়ার বিরুদ্ধে শত্রুতার মনোভাব পোষণ করেনি। তবু গত ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে মস্কোর 'বলশেভিক ইহুদি' শাসকেরা কেবল জার্মানিতে নয়, সারা ইউরোপে আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করেছে। তারা কেবল তাদের মতবাদই চাপিয়ে দিতে চেয়েছে তাই নয়, সামরিক বলপ্রয়োগের দ্বারা ইউরোপীয় জনগণের উপর প্রভুত্ব কায়েম করতে চেয়েছে। ...বৃটেন ও রাশিয়া পারস্পরিক যোগসাজস ও চক্রান্তের দ্বারা জার্মানি ও ইউরোপকে বিপন্ন করার চেষ্টা চালাচ্ছিল।

এইসব অভিযোগ শেষে উপসংহারে হিটলার বললেন, হে জার্মান জনগণ, এই মুহূর্তে এমন একটা অভিযান চলছে, শক্তির দিক থেকে তুলনা করলে এতবড় অভিযান ইতিপূর্বে পৃথিবীতে ঘটেনি। তারপর বললেন, বিশেষ কোন দেশকে রক্ষা করা এই রণাঙ্গনে আমাদের উদ্দেশ্য নয়; সমগ্র ইউরোপের নিরাপত্তা এবং আমাদের সকলের মুক্তিই লক্ষ্য। সুতরাং জার্মান রাষ্ট্র এবং আমাদের জনগণের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ আমি আজ আবার আমাদের সৈন্যদলের হাতে তুলে দেবার সিদ্ধান্ত করেছি। এই বৃহত্তম সংগ্রামে ভগবান আমাদের সহায় হোন।

সুতরাং হিটলারের বক্তব্যে কোন অস্পষ্টতা নেই। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েটকে চূর্ণ করে 'ইউরোপ রক্ষার' স্বঘোষিত মহান ব্রত তিনি গ্রহণ করলেন এবং সেই জন্য তিনি তাঁর সেনাবাহিনীকে সোভিয়েট ধ্বংসের হুকুম দিয়েছেন।

ঐদিনই রাত ৯টা ২০ মিনিটে বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল বিবিসিতে বেতার ভাষণ দেন। তিনি রাশিয়াকে সাধ্যমত সাহায্যের অঙ্গীকার ঘোষণা করেন। পরবর্তীকালে স্ট্যালিন সম্পর্কে বলতে গিয়ে চার্চিল বলেন — স্ট্যালিন আমাদের সাম্রাজ্যবাদী বলতেন, আবার আমাদেরই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়েছিলেন।

সোভিয়েট পররাষ্ট্র সচিব মলোটভ তাঁর বেতার ভাষণে জার্মান ফ্যাসিস্ট শাসকরা অনাক্রমণ চুক্তি লঙ্ঘন করে অতর্কিতে কীভাবে সোভিয়েট আক্রমণ করে বিশ্বাসঘাতকের পরিচয় দিয়েছে — তা তুলে ধরেন। প্রতিরোধ সংগ্রামের দ্বারা ফ্যাসিস্ট আক্রমণের জবাব দেবার আহ্বান তিনি জানান।

আটের পাতায় দেখুন

কোচবিহারে জেলা ছাত্র সম্মেলন

শিক্ষার বেসরকারীকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ, ফি-বৃদ্ধি, ডোনেশন প্রথা, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দেওয়া এবং স্কুলস্তরে যৌনশিক্ষা চালু করার প্রতিবাদে ও ছাত্রভর্তি সমস্যার সমাধানের দাবিতে ১৮-১৯ জুন কোচবিহার জেলার দিনহাটা শহরে অনুষ্ঠিত হল এ আই ডি এস ও-র অষ্টম জেলা ছাত্র সম্মেলন।

সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় ১৮ জুন স্থানীয় সংহতি ময়দানে বিকেল ৪টেয়। প্রায় দুই হাজার ছাত্রছাত্রী এই সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। প্রকাশ্য সমাবেশে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এস ইউ সি আই রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড দীপঙ্কর রায়। এছাড়া এ আই ডি এস ও-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড নভেন্দু পাল, রাজ্য সভাপতি কমরেড সুব্রত গৌড়ী, জেলা সম্পাদক কমরেড গৌরাঙ্গ দেবনাথ উপস্থিত ছিলেন। প্রকাশ্য সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন এস ইউ সি আই কোচবিহার জেলা সম্পাদক কমরেড শিশির সরকার এবং দিনহাটা লোকাল কমিটির সম্পাদিকা কমরেড ফিরোজা আহমেদ। সভায় সভাপতিত্ব করেন এ আই ডি এস ও-র কোচবিহার জেলা সভাপতি কমরেড মৃণালকান্তি রায়।

ঐদিন রাতে ৫৩৭ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে প্রতিনিধি অধিবেশন শুরু হয়ে চলে ১৯ জুন রাত ৯টা পর্যন্ত। সম্মেলনে কমরেড প্রদীপ রায়কে সভাপতি ও কমরেড মৃণাল রায়কে সম্পাদক করে ৩৯ জনের জেলা কমিটি, ৫২ জনের জেলা কাউন্সিল নির্বাচিত হয়।

১৮ জুন স্থানীয় সংহতি ময়দানে প্রকাশ্য সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন কমরেড দীপঙ্কর রায়।

আর জি কর মেডিকেল কলেজে এ আই ডি এস ও'র সম্মেলন

গত ২২ জুন অল ইণ্ডিয়া ডেমোক্র্যাটিক স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন-এর আর জি কর শাখার প্রথম ইউনিট সম্মেলন আর জি কর মেডিকেল কলেজের অ্যানাটমি লেকচার থিয়েটারে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রায় বছর দশেক আগে স্বল্প সংখ্যক ছাত্রের উদ্যোগে আর জি কর মেডিকেল কলেজে এ আই ডি এস ও'র কাজ শুরু হয়। সে সময় ঐ কলেজে ছাত্রসংসদে ক্ষমতায় আসীন ছিল ছাত্র পরিষদ, ছাত্র সংগঠন ডি এস এ'র-ও প্রভাব ছিল, কিন্তু আদর্শহীনতা, নিম্ন রুচি-সংস্কৃতি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মানসিকতার অভাবের জন্য তারা কেউই এস এফ আই-এর সন্ত্রাস ও আক্রমণের মুখে কোনও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। এস এফ আই ছাত্র সংসদে আসীন হয়, হোস্টেলগুলিতেও প্রভাব প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু এ আই ডি এস ও তার উন্নত আদর্শ, রুচি-সংস্কৃতি ও সংগ্রামী চরিত্র নিয়ে ধীরে ধীরে শক্তি সংগ্রহ করতে থাকে। তারা হোস্টেল এবং কলেজে এস এফ আই-এর সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে, অপসংস্কৃতির চর্চার বিরুদ্ধে সরব হয়, পাশাপাশি চলে নবজাগরণের মনীষীদের এবং আপসহীন ধারার বিপ্লবীদের জীবনীচর্চা, আলোচনা সভা ; ছাত্রস্বার্থে গড়ে ওঠে আন্দোলন।

আজ সেই স্বল্পসংখ্যক আদর্শবান, সংগ্রামী ছাত্রদের উদ্যোগে গড়ে ওঠা সংগঠন শুধু আর জি কর-এ নয়, মেডিকেল শিক্ষার জগতে ছাত্রদের আন্দোলনের একমাত্র সংগঠন হিসাবে পরিচিত। অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে ছাত্রস্বার্থে আন্দোলনের একমাত্র নেতৃত্ব।

কলেজগুলিতে সিট বাতিল, ফি-বৃদ্ধি, পরিকাঠামোর অবনতি, ক্যাপিটেশন ফি চালু করার বিরুদ্ধে এই সংগঠনের নেতৃত্বে আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং উল্লেখযোগ্য সাফল্য পাওয়া যায়। এই শক্তিকে সংহত করে ছাত্রস্বার্থে আন্দোলনকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে ২২ জুন ইউনিট সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষে 'স্কুলস্তরে যৌনশিক্ষা কতটা বিজ্ঞানসম্মত' শীর্ষক এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা করেন অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল, চিত্র পরিচালিকা শতরূপা সান্যাল, মেডিকেল শিক্ষক ডাঃ অর্ণব সেনগুপ্ত, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সুবীর হাজরা চৌধুরী এবং শিক্ষক আন্দোলনের নেতা তপন রায়চৌধুরী।

সম্মেলনে ২০ জনের নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। সম্পাদক হয়েছেন প্রতীক দত্ত, সভাপতি শুভঙ্কর চৌধুরী। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ডি এস ও রাজ্য সভাপতি কমরেড সুব্রত গৌড়ী।

হাসপাতালে চিকিৎসার দাবিতে আন্দোলনের জয়

দক্ষিণ ২৪ পরগণার উত্তর লক্ষ্মীনারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অবস্থিত যাদবপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি দীর্ঘদিন ধরেই সরকারি অবহেলার শিকার। এলাকার ৮০ ভাগ মানুষই দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করেন। ফলে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিই তাঁদের একমাত্র চিকিৎসা পাওয়ার স্থান। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আউটডোর থাকলেও তা সপ্তাহে মাত্র ৪ দিন খোলে। গত একমাস ধরে ডাক্তার আসছেন না। একজন কর্মীই যাতায়াত করছেন। প্রতিদিন রোগী আসেন প্রায় ২/৩ শত।

এই চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি সুষ্ঠুভাবে চালানোর দাবিতে এলাকার মানুষ 'যাদবপুর হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রস্তুতি কমিটি' গড়ে তোলেন। কমিটির পক্ষ থেকে ১৪ জুন মথুরাপুরে বি এম ও এইচ-এর নিকট এক প্রতিনিধি ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশনে দাবি জানান হয়, সপ্তাহে ৬ দিন আউটডোর খোলা রাখতে হবে; ডাক্তার নার্স, জি এন এম, সুইপার এবং ফার্মাসিস্ট স্থায়ী করার ব্যবস্থা করতে হবে; জীবনদায়ী ওষুধ যাতে সুরক্ষিত থাকে তার জন্য ফ্রিজের ব্যবস্থা করতে হবে এবং ৬ শয্যার ইনডোর ব্যবস্থা চালু করতে হবে। বি এম ও এইচ প্রতিনিধি দলের সাথে আলোচনা করে ডেপুটেশন গ্রহণ করেন এবং পরদিনই ডাক্তার, নার্স এবং কর্মী পাঠিয়ে দেন। আন্দোলনের এই সাফল্যে স্থানীয় মানুষ উৎসাহিত হন। কমিটির পক্ষ থেকে জানান হয়েছে, দাবিগুলি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা ঘেরাও, বিক্ষোভ, অবস্থান প্রভৃতি আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।

বালুরঘাটে যুব রাজনৈতিক ক্লাস

১৫ জুন এ আই ডি ওয়াই ও দক্ষিণ দিনাজপুর তপন ব্লক কমিটির উদ্যোগে যুবকর্মীদের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে একটি রাজনৈতিক ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। কমরেড শিবদাস ঘোষ রচিত 'যুব সমাজের প্রতি' বইটির উপর উপস্থিত কমরেডদের প্রশ্নের ভিত্তিতে আলোচনা করেন এস ইউ সি আই রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সঞ্জিত বিশ্বাস। ক্লাসে শতাধিক যুবকর্মী উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এস ইউ সি আই জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড সাগর মোদক, ব্লক সম্পাদক কমরেড নুরুল ইসলাম, ডি ওয়াই ও জেলা সভানেত্রী কমরেড নন্দা সাহা, জেলা সম্পাদক কমরেড বীরেন মহন্ত।

বিশ্ববাজারে দামবৃদ্ধি অজুহাত মাত্র

একের পাতার পর

ইকনমিক টাইমস ২৪.৬.০৫, পৃষ্ঠা ২)। এই হিসাব অনুযায়ী বিশ্ববাজারে দাম বাড়ার ফলে পেট্রলের দাম লিটারে (১৭.৫১ - ১৭.৪৬) অর্থাৎ ৬ পয়সা এবং ডিজেলের দাম (১৮.৫৩ - ১৮.০৭) অর্থাৎ ৪৬ পয়সা বেড়েছে। তাহলে পেট্রলে ২.৫০ টাকা ও ডিজেলে ২ টাকা বাড়ানো হচ্ছে কার স্বার্থে? তার উপর আছে রাজ্য সরকারের কর, সেটা ধরে পেট্রলের দাম ২.৬২ টাকা ও ডিজেলের দাম ২.০৮ টাকা বাড়ছে। অন্তত প্রকাশ্যে যে রাজ্য সরকার কেন্দ্রকে কর কমাতে বলছে, তারা বর্ধিত দামের উপর যে কর নিচ্ছে, সেটা কি দ্বিচারিতা নয়?

তেল কোম্পানির লোকসান!

সরকার বলছে, বিশ্ববাজারে তেলের দাম বাড়ায় এবং দেশের বাজারে দাম না বাড়ানোয় তেল কোম্পানিগুলির লোকসান হচ্ছে। সত্যিই কি তাই? তথ্য বলছে — "২০০৪-০৫ সালে অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কমিশনের নিট মুনাফা ৫০ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ১২,৯৮৩ কোটি টাকা (আনন্দবাজার ২১.০৬.০৫)।

রাজ্য সরকারের দ্বিচারিতা

সিপিএম বলছে, তারা তেলের দামবৃদ্ধির বিরুদ্ধে। দিল্লির যে সরকার তাদের সমর্থনে টিকে আছে; বুদ্ধদেববাবুর ভাষায় — কেন্দ্রীয় সরকার, আমরা উঠতে বললে উঠবে, বসতে বললে বসবে; তারা সিপিএমের সমর্থন ছাড়াই পেট্রল ডিজেলের দাম বাড়ালো? এবং কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচন শেষ হওয়ার সাথে সাথেই তা ঘোষণা করল সিপিএমের পরামর্শ ছাড়াই? এও কি বিশ্বাস করতে হবে! নাকি তারা চোরকে বলছে চুরি করতে আর গৃহস্থকে বলছে সজাগ থাকতে। তারা বলছে — কেন্দ্র আর্থিক প্রশ্নে বিজেপির পথেই চলছে। অথচ সমর্থন প্রত্যাহার দূরে থাক প্রত্যাহারের হুমকিটুকুও দিচ্ছে না। এদিকে রাজ্যে লোকদেখানো আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রকৃত গণআন্দোলন গড়ে তোলার পরিবেশ নষ্ট করে দিচ্ছে। পেট্রল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির অনুকূলে এবং গণআন্দোলনের প্রতিকূলে সিপিএম ও তার ফ্রন্ট শরিকদের এই দ্বিচারিতা কার স্বার্থে?

আন্দোলনে এগিয়ে আসার ডাক দিল এস ইউ সি আই

একের পাতার পর

আমাদের দল পশ্চিমবঙ্গে জনগণের দাবিতে, জনগণের সমর্থনের ভিত্তিতে ধারাবাহিক আন্দোলনের কর্মসূচি হিসাবে যখন বন্‌ধ ডাকে তখন সিপিএম নেতৃত্ব ও রাজ্য সরকার সর্বশক্তি নিয়োগ করে বন্‌ধ ভাঙবার জন্য ; অপপ্রচার করে বলে যে, এই বন্‌ধ 'কর্মনাশা', 'ছুটির দিন' ; তারা সরকারি কর্মচারীদের বেতন কাটার হুমকি দেয়, অতিরিক্ত পরিবহণ চালায়। অথচ সেই সিপিএম নেতৃত্ব এবার বন্‌ধের ডাক এড়িয়ে ২৭ জুন পরিবহণ কর্মচারীদের বাধ্য করছে ধর্মঘট করার জন্য। এই ধর্মঘটে পরিবহণ কর্মচারীদের নিজস্ব কোনও দাবি নেই। কিন্তু যেহেতু সিটু নিয়ন্ত্রিত ইউনিয়ন তাই কর্মচারীরা ধর্মঘট করতে বাধ্য হচ্ছেন। এইভাবে পরোক্ষে সরকারি বন্‌ধ করে জনগণের মধ্যে যে পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ শক্তিশালী আন্দোলনের রূপ নিতে পারত তাকে বিপথে পরিচালিত করছে এবং আন্দোলনবিরোধী মানসিকতা সৃষ্টি করছে।

শীঘ্রই কেরল ও পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন। দুই রাজ্যে সিপিএমকে কংগ্রেসের সঙ্গে লড়তে হবে তাই তাদের এইধরনের আন্দোলনের মহড়া নিতে হচ্ছে। একই কারণে কংগ্রেসের সঙ্গে বোঝাপড়ার ভিত্তিতেই তারা সমন্বয় কমিটির বৈঠক বর্জন করেছে। যেহেতু ২৭ জুনের প্রস্তাবিত এই ধর্মঘট ও ২৮ জুনের কর্মসূচি গণআন্দোলনের আন্তরিক উদ্দেশ্য নিয়ে হচ্ছে না তাই আমরা তাকে সমর্থনও করছি না।

আমরা দাবি করছি, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার পেট্রল ও ডিজেলের উপর আরোপিত সকল ট্যাক্স ও সেস্ তুলে নিক, তাহলেই বর্ধিত দাম কমে যাবে।

আমরা মনে করি, যে তৃণমূল কংগ্রেস এন ডি এ সরকারে থাকাকালীন তেলের দামবৃদ্ধিকে সমর্থন করেছে, তারও কোন নৈতিক অধিকার নেই প্রতিবাদের কথা বলার।

২১ জুন যেদিন পেট্রল ও ডিজেলের দামবৃদ্ধির ঘোষণা হয় সেদিনই কলকাতা, দিল্লি, কেরালা, ত্রিপুরা সহ বিভিন্ন রাজ্যে ও শহরে এবং ২২ জুন ঝাড়খন্ডের রাঁচিতে আমাদের দল বিক্ষোভ দেখিয়েছে এবং আগামী ১৫ দিন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ও কলকাতা শহরে, মিটিং-মিছিল-অবরোধ-আইন অমান্য প্রভৃতির মধ্য দিয়ে এই জনস্বার্থবিরোধী মূল্যবৃদ্ধি প্রত্যাহারের দাবি তোলা হবে। আমরা বিশ্বাস করি পূর্বের আন্দোলনগুলির মত এবারও জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই আন্দোলন সফল করতে এগিয়ে আসবেন।

রিগিংসর্বস্ব নির্বাচন নিয়ে নীতির বড়াই মানায় না

একের পাতার পর

একদা কংগ্রেস শাসনের অন্ধকার দিনগুলির কথাও আওড়েছেন। একথাও বলেছেন যে, তৃণমূল-বিজেপি ও কংগ্রেসের মধ্যে বহু আসনেই তলে তলে 'মহাজোট' হয়ে যাচ্ছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। ভোটের ফল প্রকাশের পর সেই কংগ্রেস সম্পর্কে সি পি এম নেতৃত্বের নীরবতার কারণ যুক্তির বিচারে একটাই হতে পারে। সর্বভারতীয় স্তরে কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁদের আঁতাত, তাঁদের শাসিত রাজ্য বাদে অন্যান্য রাজ্যে কংগ্রেসের সাথে তাঁদের নির্বাচনী জোটের পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ পরিস্থিতিতে কংগ্রেস বিরোধিতা করতে হলেও তা নিয়ে খুব বেশি যাওয়া তাঁরা সমীচীন মনে করছেন না। তাছাড়া এর পিছনে আর একটা সম্ভাবনাও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায়না। যেমন করে তাঁদের সমর্থনের ভিত্তিতে কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকারকে তাঁরা টিকিয়ে রেখেছেন, ঠিক সেইভাবে মাত্র ৯ আসনের গরিষ্ঠতা নিয়ে পুরসভা চালাতে গিয়ে যদি সি পি এম-কে বিপদে পড়তে হয়, তবে কংগ্রেসের (২১ আসন) সমর্থন পাওয়ার পথটা খোলা থাকা চাই। কারণ, দলের সাথে ব্যক্তি ক্ষমতালিপ্সাও পরিষদীয় রাজনীতিতে যে হারে ক্রমে তীব্র রূপ নিচ্ছে, তাতে সমস্ত সম্ভাবনা হিসাবের মধ্যে রেখেই এগুনো ভাল। বিজেপি'র 'সাম্প্রদায়িকতার বিপদ'-এর ধুয়া তুলে কেন্দ্রে যখন কংগ্রেসের সাথে সি পি এম-এর গাঁটছড়া বাঁধাই আছে, তখন তেমন প্রয়োজনে কলকাতা পুরসভায় আপত্তি কিসের ? এসব বিষয়ে যুক্তি সাজাতেও তাঁদের কোনদিন কোন অসুবিধা হয়না। শুধু দেখতে হবে, সময়টা যেন কোনও ভোটের আগে না হয়, কারণ ভোটের বাজারে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সি পি এম নেতাদের জ্বালাময়ী ভাষণ দিতেই হবে। সি পি এম-এর 'উন্নত নীতি ও মতাদর্শের' এটা একটা নমুনা !

নীতি-আদর্শের কথা উঠলে অনিবার্যভাবেই কিছু প্রশ্ন এসে পড়ে। প্রথম প্রশ্ন — ২০০০ সালে তৃণমূল-বিজেপি জোট যখন কলকাতা পুরসভায় জয়ী হয়ে কংগ্রেসের সমর্থনে বোর্ড পেয়েছিল, তখনও রাজ্যে সি পি এম-ফ্রন্ট সরকারই ছিল, তাদের 'উন্নত নীতি-আদর্শ' ছিল, 'উন্নয়নমূলক কর্মসূচি'ও ছিল। তবুও তৃণমূল-বিজেপি জোট পুরবোর্ড পেয়েছিল কেন ? তবে কি বলতে হবে, সেদিন তৃণমূল-বিজেপি জোটের উন্নত নীতি ও মতাদর্শ ছিল ? ২০০০ সালে বিধাননগর পুরসভায় সি পি এম-ফ্রন্ট পেয়েছিল ১২ ও তৃণমূল-বিজেপি জোট ১১ আসন। মাত্র ১টি আসনের ব্যবধান থেকে কি বলা চলে, সেদিন তৃণমূল-বিজেপি জোটের 'উন্নত নীতি ও মতাদর্শে'র সাথে সি পি এম-ফ্রন্টের 'উন্নততর নীতি ও মতাদর্শে'র হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের জন্যই ঐ ফলাফল হয়েছিল ? এবারও যে উত্তরপাড়া পুরসভা তৃণমূল কংগ্রেস দখলে রাখল এবং সি পি এম-ফ্রন্ট আবার পরাস্ত হল, সে কি তৃণমূল কংগ্রেসের 'উন্নত মতাদর্শে'র জন্য ?

তাঁরা তাঁদের সাফল্যের পিছনে ব্যাপক উন্নয়নমূলক কাজকর্ম, স্বচ্ছতা ও রাজনৈতিক নৈতিকতা এবং বামফ্রন্টের ঐক্য ও উন্নত মতাদর্শের যে দাবিগুলি করেছেন তা কতটা সত্য, তা এখন বিচার করে দেখা যাক্। প্রথমত, সি পি এম নেতারা তাঁদের যে উন্নত নীতি ও মতাদর্শের কথা বলছেন, সেটা কোন্ নীতি ও মতাদর্শ এবং কোথায় তা তৃণমূল, বিজেপি ও কংগ্রেসের থেকে উন্নত ? মুখে মার্কসবাদ ও ঝান্ডার লাল রং বাদ দিলে সরকার পরিচালনার দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্নে হোক, পুলিশ-প্রশাসনে সংকীর্ণ দলবাজির প্রশ্নে হোক, মন্ত্রী-নেতাদের আমলাতান্ত্রিক মনোভাবের প্রশ্নে হোক, আর্থিক নীতি পরিচালনার প্রশ্নে হোক, মালিক-শিল্পপতিগোষ্ঠীকে তোয়াজের প্রশ্নে হোক, শ্রমিক-চাষী ও জনবিরোধী নীতি ও কার্যক্রম গ্রহণের প্রশ্নে হোক, গণআন্দোলন দমনের প্রশ্নে হোক, রাজনীতির অপরাধীকরণের প্রশ্নে হোক, দলীয় নেতা-কর্মীদের আচার আচরণ রুচি সংস্কৃতির প্রশ্নে হোক — কোথায় তাঁরা তৃণমূল, বিজেপি ও কংগ্রেস থেকে ভিন্ন ? কোন ক্ষেত্রেই মানুষ তার থেকে উন্নত কোন পার্থক্য তাঁদের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন না।

দ্বিতীয়ত, তাঁদের দাবি — বামফ্রন্ট সরকার ব্যাপক উন্নয়নমূলক কাজকর্ম করছে। সব পক্ষই এখন 'উন্নয়ন' 'উন্নয়ন' বলে ভাষণ দিচ্ছে, তাতে কোনও সংশয় নেই। কিন্তু বাস্তবে কার কী উন্নয়ন হয়েছে বা হচ্ছে ? শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, বিদ্যুৎ, রাস্তাঘাট, নিকাশি, পরিবেশ, পরিবহণ, সামাজিক নিরাপত্তা প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই ঢালাও ২৯ বছরের সি পি এম শাসনে নিরবচ্ছিন্ন অধঃপতনের অভিজ্ঞতা ভুক্তভোগী গরিব-মধ্যবিত্তেরা জীবন দিয়ে প্রতিমুহূর্তে অনুভব করছেন, তবুও তাঁরা দলে দলে সি পি এম-কে ভোট দিয়ে বেশি আসন পাইয়ে দিয়েছেন, একথা অতিবড় অজ্ঞজনেও এখন বিশ্বাস করে না।

তৃতীয়ত, তাঁদের দাবি — কলকাতার উন্নয়ন সম্পর্কে সি পি এম-ফ্রন্ট সরকারের সুস্পষ্ট দিশা আছে। এটা সত্য কথা এবং এ প্রশ্নে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত পূর্বতন পুরবোর্ডের বা মেয়র সুব্রত মুখার্জীর দিশার সাথে সি পি এম-এর দিশার ঐক্য ও মিল কলকাতাবাসীর অজানা নয়। মেয়র বলেছিলেন, তিনি কলকাতাকে সিঙ্গাপুর, অর্থাৎ দেশি-বিদেশি পুঁজিপতি ও ধনীদের 'স্বপ্নের শহর' করে তুলবেন। আর সি পি এম-ফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'কলকাতা হবে পূর্ব দুনিয়ার পুঁজির প্রবেশের দরজা' (Gateway to East) ; সহজ কথায় যার অর্থ একই। কলকাতাকে তাঁরা দেশিবিদেশি পুঁজিপতিদের নানা ভোগবিলাসের ও পছন্দের শহর করে তুলতে চান। তাঁদের এই প্রচেষ্টার ফলে কলকাতা দ্রুত তার পুরনো ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি হারাচ্ছে — গড়ে উঠছে পশ্চিমী দুনিয়ার নাইট ক্লাব কালচার। এই কলকাতা বলতে ভি আই পি রোড, বাইপাস, পার্ক স্ট্রীট, চৌরঙ্গির কলকাতা — যেখানে রাস্তাঘাট হবে ঝকঝকে, থাকবে ব্যয়বহুল বিলাসী সিনেমা হল, হোটেল, পার্ক, দামী শপিং মল, ধনীদের সন্তানদের জন্য দামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। উন্নয়নের এই 'সুস্পষ্ট দিশা'য় গরিব মধ্যবিত্তের স্থান নেই, তারা অবাঞ্ছিত। গরিবের বস্তি তাই পে-লোডারে গুঁড়িয়ে যায়, গৃহহীন হয়ে যায় খালপাড়ের গরিব মানুষ, হকার উচ্ছেদ হয়ে যায় জীবিকা থেকে। গরিব ঘরের ছেলেমেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট কর্পোরেশন স্কুলগুলি জীর্ণ হয়ে উঠে যায়। পুরবাসীরা মশার উপদ্রব ও ম্যালেরিয়া থেকে রক্ষা পায় না, পরিশ্রুত বিশুদ্ধ ও প্রয়োজনীয় পরিমাণে পানীয় জল মেলে না, যাও মেলে তাও বহু ক্ষেত্রে আর্সেনিক দুষ্ট, জঞ্জাল জমে থাকে রাস্তায়, গর্তে ও খোলা ম্যানহোলে পড়ে মানুষ মারা যায়। অতীতে সি পি এম-ফ্রন্ট চালিত বা গত পাঁচ বছর তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত কলকাতা পুরসভার একই নীতি, তার ফলাফলও একইরকম। এই নীতি ও কার্যক্রম যদি মানুষের গভীরে প্রভাব ফেলে থাকে, তবে তা ইতিবাচক নয়, নেতিবাচক হতে বাধ্য।

চতুর্থত, তাঁদের দাবি — সি পি এম-ফ্রন্ট সরকারের স্বচ্ছতা ও রাজনৈতিক নৈতিকতা। ২৯ বছর সি পি এম-ফ্রন্ট সরকারের শাসনে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এই রাজ্যের কোনও সাধারণ মানুষের কাছে সরকারের এই দাবি এতটাই হাস্যকর হবে যে, তারা এ নিয়ে কোনও বিতর্কে প্রবৃত্ত হতেই আগ্রহ দেখাবে না। সি পি এম-এর সমগ্র রাজনীতিটাই যেখানে অনৈতিকতার উপর দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে তাদের দ্বারা পরিচালিত কোনও সরকারের কাছ থেকে রাজনৈতিক নৈতিকতা আশা করাই তো মূর্খামি ! রাজনৈতিক নৈতিকতা থাকলে কোনও সরকার ও শাসকদল দিল্লিতে উদারনীতির বিরুদ্ধতা করে পশ্চিমবঙ্গে নিজেরা তা চালু করতে পারেনা। নৈতিকতা থাকলে গরিবদরদের কথা বলে ভোট নিয়ে ক্ষমতায় বসে গরিবের বস্তি উচ্ছেদ করতে পারে না, শোষিত-নিপীড়িত শ্রমিকের পরিবর্তে শোষক মালিকশ্রেণীর পক্ষে দাঁড়াতে পারে না, গরিবের আন্দোলন লাঠি-গুলি দিয়ে দমন করতে পারে না। নৈতিকতা থাকলে কোনও শাসকদল বা সরকার ভোট শেষ না হওয়া পর্যন্ত পেট্রল-ডিজেলের দাম বাড়াবার ক্ষেত্রে অপেক্ষা করতে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানাতে পারে না। রাজনৈতিক নৈতিকতা থাকলে কোনও সরকার পুলিশ দিয়ে গণআন্দোলনের মহিলা কর্মীদের রাজপথে বিবস্ত্র করে মারতে পারে না। সবচেয়ে বড় কথা বিন্দুমাত্র নৈতিকতা থাকলে বামপন্থার নামে কেউ এমন নির্লজ্জভাবে লোক ঠকাতে পারে না। এর দ্বারা তাঁরা বামপন্থাকে কলঙ্কিত করেছেন শুধু নয়, মানুষের বিশ্বাসের জায়গাটা ভেঙে দিয়ে শোষিত জনগণের ওপর মালিকশ্রেণীর শোষণ-অত্যাচারকে নিরঙ্কুশ করে দিয়েছেন। বস্তুত, গত ২৯ বছরে রাজনৈতিক অনৈতিকতার এত অসংখ্য নজির তাঁরা সৃষ্টি করেছেন, যার কয়েকটি দিতে গেলেও একটি নিবন্ধে কুলোবে না। সুতরাং এসব দাবি সি পি এম নেতাদের না করাই ভাল।

পঞ্চমত, তাঁদের দাবি — বামফ্রন্টের 'ঐক্য ও উন্নত মতাদর্শ'। একথা ঠিক, বামফ্রন্ট নামের জোটটি গত ২৯ বছর ধরে টিকে আছে, ভাঙেনি। এবং সেটা সি পি এম একাধিপত্যের জোরে ও নানা সুযোগ-সুবিধা শরিকদের পাইয়ে দেওয়ার সুবাদে টিকিয়ে রাখতে পেরেছে। অন্য শরিক দলগুলির ভিন্ন রাজনীতি, মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গির কথাটা একটা কথার কথা ছাড়া কিছুই না, থাকার প্রশ্নও নেই। শুধুমাত্র নিজেদের আলাদা অস্তিত্ব দেখানো ছাড়া এর কার্যকারিতা আছে বলে সাধারণ মানুষও মনে করেন না। একথাও অজানা নয় যে, নামে ফ্রন্ট হলেও সি পি এম-ই সেখানে প্রথম ও শেষ কথা। এই জোটের কথা ও উদ্দেশ্যকে যদি 'মতাদর্শ' নামে অভিহিত করা হয়, তবে সেটাও একটাই — তা হল, বুর্জোয়াদের পদলেহন থেকে ভোটে জুয়াচুরি পর্যন্ত যেকোন উপায়ে সরকারি ক্ষমতা ভোগ করা। এ ব্যাপারে তৃণমূল, বিজেপি ও কংগ্রেসের 'মতাদর্শে'র সাথে সি পি এম-ফ্রন্টের কোনও পার্থক্যই নেই। বস্তুত, তৃণমূল-বিজেপি জোট অথবা কংগ্রেসের ইউ ডি এ-র মতোই সি পি এম চালিত বামফ্রন্টও একটি চরম সুবিধাবাদী জোট, শুধু পার্থক্য, এরা বামপন্থার নাম ভাঙিয়ে খাচ্ছে।

গণশক্তি লিখেছে — 'দুর্নীতি, কেলেঙ্কারি, অপদার্থতা ছাড়া তৃণমূল-বিজেপি বোর্ড আর কিছুই দিতে পারেনি। গরিব মানুষের স্বার্থ অবহেলিত হয়েছে।'' এই বক্তব্য পুরোপুরি সত্য। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ১৯৮৫ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত ১৫ বছর একটানা সি পি এম-ফ্রন্ট যখন কলকাতা পুরসভা চালিয়েছিল, অথবা গত ২৯ বছর ধরে সি পি এম-ফ্রন্ট ক্ষমতায় থেকে রাজ্যটা যেভাবে চালাচ্ছে, তাতে সি পি এম-ফ্রন্ট সম্পর্কেও কি গণশক্তির ঐ সত্য কথাগুলো একইভাবে প্রযোজ্য নয় ? এ কথায় পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ গরিব-মধ্যবিত্ত মানুষ সায় দেবেন শুধু নয়, সি পি এম বিরোধী মানসিকতা আজ এতটাই প্রবল যে, অনেকেই তৃণমূল-বিজেপি ও কংগ্রেসের চেয়েও সি পি এম-ফ্রন্টকে খারাপ বলবেন।

এই বাস্তব পরিস্থিতিতে কলকাতা পুরনির্বাচনে বামফ্রন্ট বেশি আসন পেয়েছে কোনও উন্নত নীতি-আদর্শের জোরে — একথা যুক্তিতে দাঁড়ায় না, বাস্তব তা বলে না, কোনও সচেতন মানুষ তা বিশ্বাসও করেন না। বরং কলকাতা শহরে তো বটেই, প্রায় গোটা রাজ্যের অধিকাংশ সাধারণ মানুষ, এমনকী সি পি এম-এর সৎ কর্মী, বা কোনওভাবে সি পি এম-এর সাথে যুক্ত মানুষরাও সি পি এম নেতৃত্বকে এখন সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত, নীতিহীন, ভোগসর্বস্ব বলে মনে করেন। ব্যাপক অংশের মানুষের মধ্যে সি পি এম সম্পর্কে এখন প্রবল ঘৃণা ও বিরক্তি। ট্রেনে-বাসে-ট্রামে-অফিসে-বাজারে-দোকানে সর্বত্র বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে মানুষের বিক্ষোভ প্রকাশ্যে ফেটে পড়ছে। এটা আজ এ রাজ্যে প্রতিটি মানুষের অভিজ্ঞতা। অবস্থা এমন যে, কোনও কট্টর সিপিএম সমর্থক সেখানে উপস্থিত থাকলেও বামফ্রন্ট সরকারের সমর্থনে কিছু বলা দূরের কথা, পরিচয় পর্যন্ত দিচ্ছে না। অবস্থাটা এই রাজ্যে ষাটের দশকে কংগ্রেসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সেই সময় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মানুষের বিক্ষোভ এমন জায়গায় পৌঁছেছিল যে, খদ্দর পরে কেউ রাস্তায় চলতে লজ্জা পেত।

এই যেখানে বাস্তব, অর্থাৎ সিপিএম যেখানে জনসাধারণ থেকে এইভাবে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং তার বিরুদ্ধে মানুষের ঘৃণা ও ক্ষোভ প্রকাশ্যে ফেটে পড়ছে, সেখানে এটা কি করে বিশ্বাসযোগ্য যে, সেই জনগণই ভোটের সময় দলে দলে লাইন দিয়ে তাকে ভোট দিয়ে নির্বাচনে জেতাচ্ছে শুধু নয়, তার ভোটের হারও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে ? গত কয়েক বছর ধরে এই রহস্যটাই লোকের মুখে মুখে আলোচনার বিষয় হয়েছে। তবে বেশ কয়েকটি নির্বাচন দেখার পর একটা বিরাট অংশের মানুষের কাছে আজ আর এটা খুব জটিল একটা রহস্য নয়। কারণ, ইতিপূর্বে সি পি এম নেতাদের রিগিং পরিকল্পনায় যে সূক্ষ্মতার পরিচয় ছিল, এখন তার অনেকটাই নগ্ন হয়ে গিয়েছে। যদিও গত ২২ মে মিউনিসিপ্যালিটি নির্বাচনগুলোতে কয়েকটি জেলায় প্রায় সকল ওয়ার্ডেই ঢালাও ছাপ্পা ভোট করানোর ফলে ভোট পড়ার হার যেভাবে ৮০ থেকে ৯০ শতাংশে উঠে গিয়েছিল এবং মানুষের কাছে ব্যাপারটা একেবারে নগ্নভাবে ধরা পড়েছিল, কলকাতা পুরসভা নির্বাচনে সেটা তাঁরা করেননি। ভোট পড়ার হারকে গড়ে ৬০-৬৫ শতাংশের মধ্যে বেঁধে রাখার চেষ্টা করেছেন, যাতে রিগিং নগ্ন না হয়ে যায়। রিগিং-এর অভিযোগ উঠলেই সিপিএম নেতৃত্ব একটাই যুক্তি দিয়ে থাকেন, তা হচ্ছে, রিগিং হলে বিরোধীরা আসন পায় কি করে ? একথা ঠিক, অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান গোয়ালা যখন দুধে জল মেশায় তখন সেটা হিসাব করেই মেশায় যাতে লোকে ধরতে না পারে। রিগিং-এর ব্যাপারে তাঁদের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও অভিজ্ঞতা কেউ চ্যালেঞ্জ করতে পারবেনা। তাছাড়া একথাও সত্য, তৃণমূল কংগ্রেস সহ কংগ্রেসও যেখানে যেখানে দাপট বা ক্ষমতা আছে সেখানে তারাও একই কাজ করেছে।

১৯ জুন ভোটপর্ব মিটে যাওয়ার পর ''তারা বাংলা'' টিভি চ্যানেলে ভোট সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জী পুলিশের ভূমিকা নিয়ে অভিযোগ তুলেও বলে ফেলেন, ''আমাদের এদিকটায় পুলিশ মোটামুটি নিরপেক্ষ ছিল, কিন্তু অন্য বহু জায়গায় পুলিশ সিপিএমের হয়ে কাজ করেছে।'' তৃণমূল নেত্রীর বক্তব্য থেকেই বোঝা যায় যে, পুলিশের এবারের আচরণ ও কার্যকলাপ ছিল অত্যন্ত সুপরিকল্পিত, অবশ্যই ওপরতলার নির্দেশে। এভাবেই অবস্থা অনুযায়ী কিছু আসনকে সিপিএম নিজেদের রিগিং-এর আওতায় বাইরে রেখেছে শুধু নয়, পরিকল্পিতভাবেই কিছু কিছু আসনে তৃণমূল ও কংগ্রেসকেও রিগিং করতে সেভাবে বাধা দেয়নি।

সেদিন বুথে বুথে সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা কী ? বুথ জ্যাম করে ভোট, ছাপ্পা ভোট, প্রকৃত ভোটারকে ফিরিয়ে দেওয়া ইত্যাদি সবই যখন চলছে, পুলিশ তখন নীরব দর্শক। কোথাও এ

সাতের পাতায় দেখুন

একমাত্র গণউদ্যোগই রিগিং ও সন্ত্রাস রুখতে পারে

ছয়ের পাতার পর

ব্যাপারে কোনও ভোটার বা রাজনৈতিক দলের কর্মী পুলিশের সাহায্য চাইলে ডিউটি অফিসার বলেছেন, বুথের ভিতর কী হচ্ছে, তা দেখার দায়িত্ব তাদের নয়। কোনও কেন্দ্রে যদি এই ব্যাখ্যা দিতে কোনও পুলিশ কর্মীর মধ্যে কণামাত্র দ্বিধা দেখা গিয়েছে, তৎক্ষণাৎ সিপিএমের লোকজন এসে বলেছে, ''পুলিশ কী করবে, বুথের মধ্যে ঢোকার অধিকার পুলিশের নেই।'' অধিকাংশ জায়গায় নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত নির্দেশ সত্ত্বেও প্রিসাইডিং অফিসাররা পরিচয়পত্র দেখতে না চেয়েই অবাধে ভোট দিতে দিয়েছেন। পরিকল্পনার রূপরেখা এর থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায়।

ভোটপর্বের বর্ণনা দিতে গিয়ে পরের দিন দৈনিক স্টেটসম্যান পত্রিকা লিখেছে, ''ঢাকঢোল পিটিয়ে ২৮ হাজার পুলিশ রাস্তায় নামিয়েও রিগিং রুখতে পারলনা কলকাতা পুলিশ। ... হাতে বোমা, কোমরে পিস্তল গুঁজে সিপিএম কর্মীরা বেলা ১২টার মধ্যেই উত্তর কলকাতার অধিকাংশ বুথে 'শান্তির ভোট' শেষ করলেন। বেলা ১২টা বাজার আগেই অনেক বুথেই ভোটপর্ব শেষ হয়ে গেল।'' প্রতিদিন পত্রিকার এক সাংবাদিক লিখেছেন, ''কোনও দলই বাদ নেই। কোনও রাজনৈতিক নেতাই নিজেদের দায় এড়াতে পারেন না। বাস্তব সত্যিটা হল, যার যেখানে প্রভাব, সেই দল সেখানে সেইভাবে ভোট করিয়ে নিয়েছে। বিশেষ করে সেইসব ওয়ার্ডগুলিতে যেখানে গত পুরভোটে খুব কম ব্যবধানে হারজিৎ হয়েছিল। রবিবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত বিশেষত কলকাতা ও সল্টলেকে যেভাবে ভোট হতে দেখলাম, তাতে নিজেরই লজ্জা হচ্ছে, আমরা নাকি নিজেদের সভ্য বলে বড়াই করি।''

ভোটে রিগিং মানে শুধু ভোটের দিন বুথজ্যাম ও ছাপ্পা ভোট দেওয়া নয়। এর প্রক্রিয়া শুরু হয় অনেক আগে। আরও লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হল, ভোটের দিন যারা দলে দলে ছাপ্পাবাহিনীর কাজ করে, তাদের অধিকাংশই দলীয় কর্মী বলতে যা বোঝায়, তা নয়। এমনকী ভোটের প্রচারের সময়ও এদের পাওয়া যায়না। শুধু ভোটের দিনের জন্য এরা পার্টির বিশেষ কোনও ঠিকাদারের (নেতা বা সংগঠক) নির্দেশে বুথে বুথে ঘুরে ছাপ্পা ভোট দেয়। কিসের বিনিময়ে তারা এটা করে ? দোকান, লাইসেন্স, লোন থেকে শুরু করে নগদ টাকার কারবার চলে এখানে, টাকার জোরে কীভাবে রাজনৈতিক দলগুলি যুবকদের কিনে নিচ্ছে, শাসকদল গোপন লেনদেনের মধ্য দিয়ে বিরোধী দলের প্রার্থী সহ কর্মীদের পর্যন্ত কিনে ফেলছে, তা প্রত্যক্ষদর্শী ছাড়া অন্যরা ধরতেই পারবেন না। সাধারণ মানুষ এসব এখন কিছুটা ধরতে পারছেন বলেই ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার আগ্রহ এবার কলকাতার নাগরিকদের মধ্যে তেমন দেখা যায়নি। প্রকৃত ভোটদাতার হিসাব পাওয়ার উপায় নেই। যদি তা পাওয়া যেত, তবে নিঃসন্দেহে দেখা যেত যে, এবার ৩০ থেকে ৪০ শতাংশের বেশি মানুষ ভোট দিতেই যাননি। কিন্তু তাঁদের ভোট পড়ে গিয়েছে। শতাংশের হিসাবে ভোটের হার দাঁড়িয়েছে গড়ে ৬৫ থেকে ৭০ শতাংশ। কলকাতার পুরভোট দেখিয়ে দিল, নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করার কাজে সিপিএম, তৃণমূল, কংগ্রেস, বিজেপি কেউই পিছপা নয়। অথচ, সিপিএমের মুখে বামপন্থার বুলি ফোটে, কংগ্রেস-বিজেপি-তৃণমূলের মুখে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের বুলি।

কেউ কেউ বলছেন, কমিউনিস্টরা পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেনা, তারা একদলীয় শাসন চায় ; এবং সিপিএম 'একটি কমিউনিস্ট পার্টি', অতএব তারা পশ্চিমবঙ্গে একদলীয় শাসন কায়েম রাখার জন্য নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করেছে। যাঁরা এভাবে ভাবছেন, তাঁরা যদি একটু তলিয়ে মূল রাজনীতিটা ধরবার চেষ্টা করতেন, তাহলেই তাঁদের স্পষ্ট বোঝবার কথা যে, একটি রাজ্যের সরকারে থেকে সিপিএমের পক্ষে প্রতিটি নির্বাচনে এভাবে জালিয়াতি করে যাওয়া সম্ভবই ছিলনা — যদি কেন্দ্রীয় সরকার, কেন্দ্রীয় প্রশাসন, নির্বাচন কমিশন সিপিএম-কে প্রকৃতই আটকাতে চাইত। আজ না হয় কেন্দ্রে সিপিএমের সমর্থনে কংগ্রেস সরকার রয়েছে, কিন্তু ২০০১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের সময়, কিংবা ২০০৪ সালে লোকসভা নির্বাচনের সময় তো কেন্দ্রে তৃণমূল-বিজেপি জোট সরকার ছিল। তারা সিপিএম-কে আটকাল না কেন ? ২০০৪ সালে লোকসভা নির্বাচনের সময় কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে আমানুল্লা খান নামে একজন আই এ এস অফিসারকে বিশেষ পর্যবেক্ষক করে এরাজ্যে পাঠানো হয়েছিল। তিনি অবাধ নির্বাচনের প্রয়োজনে কিছু পুলিশ অফিসারকে বদলি করেছিলেন, কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করার চেষ্টা করেছিলেন, এতেই বিপন্ন হয়ে রাজ্যের অন্যতম শীর্ষ সিপিএম নেতা বিমান বসু সাংবাদিকদের ডেকে দলের কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, ভোটের দিন আমানুল্লা খানকে দেখলে তাঁর 'কলার ধরে বের করে দেবেন'। নির্বাচন পরিচালনার সর্বোচ্চ ক্ষমতাধারী সংবিধানপ্রদত্ত অধিকারে বলীয়ান নির্বাচন কমিশনের বিশেষ পর্যবেক্ষককে এই ভাষায় এভাবে প্রকাশ্যে হুমকি দেওয়ার পরও কেন্দ্রের বিজেপি সরকার বা নির্বাচন কমিশন কেউই সিপিএম দল বা তার সরকারের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই নেয়নি, অথচ চাইলে তারা অনেক কিছুই করতে পারত। কেন করল না ? শুধু তাই নয়, ঐ আমানুল্লা খান সেসময় এরাজ্যে নির্বাচনে জালিয়াতি করার জন্য সিপিএম কীভাবে প্রশাসন ও পুলিশ থেকে শুরু করে স্তরে স্তরে জাল ছড়িয়েছে তার বিবরণ দিয়ে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে ৮৭ পাতার একটি রিপোর্ট জমা দেন, সম্প্রতি যার কিছু অংশ দৈনিক স্টেটসম্যান পত্রিকা প্রকাশ করেছে। এটা কী বিস্ময়ের নয় যে, বিজেপি সবকিছু জেনেও, কংগ্রেস ও তৃণমূল নেতা-নেত্রীরা সব জেনেও একটিবারও লোকসভায় ঐ রিপোর্ট প্রকাশ করার জন্য দাবি তোলেন নি, নির্বাচন কমিশনও আমানুল্লা রিপোর্ট প্রকাশে কোন আগ্রহ দেখায়নি, রিপোর্ট ধুলো চাপা পড়েছে ! এর কারণ কি ?

কারণ, পার্লামেন্টারি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সুতোটা যাদের হাতে থাকে, সেই পুঁজিপতিশ্রেণীই চাইছে পশ্চিমবাংলায় সিপিএম ক্ষমতায় থাকুক। ২৮ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের সরকারে থেকে সিপিএম যেভাবে পশ্চিমবঙ্গের জনগণের আন্দোলনমুখী চেতনাকে মেরে দিতে পেরেছে, সুবিধা দিয়ে তথাকথিত প্রগতিশীল বলে পরিচিত বুদ্ধিজীবীদের বিবেক কিনে নিতে পেরেছে তা কংগ্রেস বা বিজেপি'র মতো চিহ্নিত বুর্জোয়া দলের দ্বারা সম্ভব ছিলনা। এর ফলে, সিপিএম আজ ব্যাপক হারে রিগিং করলেও তা একটি সর্বভারতীয় ইস্যু হয়ে উঠছে না, বুর্জোয়া প্রচারমাধ্যম তা করছে না। উল্টে কেন্দ্রে বিজেপি ক্ষমতায় থাকলে চরম সাম্প্রদায়িক আদবানির সাথে 'খাঁটি ধর্মনিরপেক্ষ' সিপিএম মুখ্যমন্ত্রীর গভীর ঘনিষ্ঠতা হয়ে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, ভারতের এক নম্বর ধনী পুঁজিপতি আজিম প্রেমজি বলছেন, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ভারতের শ্রেষ্ঠ। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের ঋণদাতা ডিএফআইডি, মার্কিন বাণিজ্য সম্পর্কিত কূটনীতির জনৈক বিশেষজ্ঞ, ইত্যাদি ভারতীয় ও বিদেশি পুঁজির প্রতিনিধিদের মুখে পশ্চিমবঙ্গের সিপিএম সরকারের ভূয়সী প্রশংসা। আসলে ওরা বিলক্ষণ জানে যে, সিপিএম-সিপিআই-এর নেতারা হচ্ছেন ক্রুশ্চেভ, ব্রেজনেভ, গরবাচেভ ও দেং শিয়াও পিঙদের ভাবশিষ্য, ওদের পথেরই পথিক — যারা কমিউনিস্ট নামের আড়ালে একচেটিয়া পুঁজির পরম সেবাদাস।

একথা মনে করা ভুল যে, ভারতবর্ষে একমাত্র সিপিএম-ই রিগিং করে পশ্চিমবঙ্গের সরকারে রয়েছে। নির্বাচনে রিগিং এখন সকল রাজ্যে সকল আঞ্চলিক ও জাতীয় বুর্জোয়া দলই করছে। উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের কথা সকলেই জানেন। কিন্তু খোঁজ নিলে দেখা যাবে, বাকি সকল রাজ্যেই বিপুল ব্যয়সাধ্য প্রচার, টাকার বন্যা, জাত-পাত, সাম্প্রদায়িকতার বিষ, ভোটের আগে ঢালাও মদ বিতরণ, ও সর্বোপরি পেশীশক্তির জোরেই ভোট হচ্ছে। এগুলি সবই সম্ভব হচ্ছে প্রশাসনের মদতে ও সমর্থনে। শুধু ভারতবর্ষ কেন, পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের স্বর্গরাজ্য বলে কথিত আমেরিকা-ব্রিটেনেও প্রেসিডেন্টরা জিতছে ব্যাপক কারচুপি করে, জনমতের স্পষ্ট রায়ের ভিত্তিতে নয়। এই নির্বাচনী জালিয়াতির উপায়টা একেক দেশে একেক রকম। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বাজার সঙ্কট যত তীব্র হচ্ছে, শোষিত মানুষের জীবনে বিপর্যয় যত নেমে আসছে, ততই একথা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে, পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র আজ আর অফ দি পিপল, ফর দি পিপল, বাই দি পিপল নয়। পুঁজিবাদের উন্মেষের যুগটা বাদ দিলে কোনদিনই বুর্জোয়া গণতন্ত্রে জনমতের প্রাধান্য ছিলনা, ক্রমে ক্রমে পুঁজির নিয়ন্ত্রণ তার ওপর ক্রমেই দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়েছে। আজ সেটা একেবারে নগ্ন হয়ে গিয়েছে। ভারতেও সেটাই ঘটছে।

বুর্জোয়ারা তীব্র অনিরসনীয় সংকটের মধ্যে পড়ে যেভাবে জনগণের সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি একের পর এক হরণ করছে, ভোটের নামের আড়ালে জনগণের রোষ থেকে পুঁজিবাদী শোষণ ও শাসনকে টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে ভয়ভীতি-সন্ত্রাস ও কারচুপির মধ্য দিয়ে ভোটকে প্রহসনে পরিণত করছে, সিপিএম প্রকৃত মার্কসবাদী দল হলে যেন তেন প্রকারেণ ক্ষমতা দখলের জন্য বুর্জোয়াশ্রেণীর সেই চক্রান্তকেই এইভাবে শক্তিশালী করতনা। তারা বরং সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করত, মানুষকে তার গণতান্ত্রিক অধিকার স্বচ্ছন্দ ব্যবহারের পূর্ণ সুযোগ দিত এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখা, গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি পুনরুদ্ধার, রক্ষা ও সম্প্রসারণের জন্য লড়ত। কারণ, ভয়ভীতি সন্ত্রাসের পরিবেশ নয়, একমাত্র আলাপ-আলোচনা-তর্কবিতর্ক পরিচালনার মত সুস্থ গণতান্ত্রিক পরিবেশের মধ্য দিয়েই জনতার রাজনৈতিক চেতনার বৃদ্ধি ঘটতে পারে এবং বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে উচ্ছেদের পরিপূরক শক্তিশালী গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে উঠতে পারে।

এই প্রসঙ্গে ১৯৫২ সালে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির ১৯তম কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে বিশ্বের সকল দেশের কমিউনিস্টদের প্রতি মহান নেতা স্ট্যালিনের আহ্বান বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি বলেছিলেন, দেশে দেশে বুর্জোয়াশ্রেণী এখন ডলারের বিনিময়ে স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে বেচে দিচ্ছে। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পতাকা বুর্জোয়ারাই ফেলে দিচ্ছে, তাই আজ দেশে দেশে কমিউনিস্টদেরই সেই পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরতে হবে। অর্থাৎ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক অধিকারগুলিকে রক্ষার জন্য প্রকৃত কমিউনিস্টদেরই লড়াই করতে হবে। ঐ আহ্বানের মধ্য দিয়ে কমরেড স্ট্যালিন একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা তুলে ধরেন। বুর্জোয়াশ্রেণীই যখন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ও পরিবেশকে ধ্বংস করছে, তাকে রক্ষা করার জন্য কমিউনিস্টরা যদি সংগ্রাম না করে তবে ফ্যাসিস্ট শাসন কায়েমের বুর্জোয়া শ্রেণীচক্রান্তের পথই সুগম করা হবে।

ঐ আহ্বানের দ্বারা তিনি এই ঐতিহাসিক শিক্ষাকেই ধরিয়ে দিতে চেয়েছেন যে, সমাজবিকাশের ধারায় বুর্জোয়া গণতন্ত্রের যে ভূমিকা রয়েছে, তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার মধ্য দিয়েই তার সীমাবদ্ধতাকে জনগণের সামনে উদঘাটিত করে দিতে হয়, শোষণমূলক সমাজপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রতিবন্ধকতাকে জনগণের উপলব্ধিতে নিয়ে যেতে হয়। একমাত্র তখনই জনগণ বুর্জোয়া গণতন্ত্র থেকেও উন্নত সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে উত্তরণের আবশ্যিকতা বুঝবে, সেজন্য তাদের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা জাগবে। তখন জনগণের আন্তরিক সমর্থনে পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবী আন্দোলন তথা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম শক্তিশালী হবে। মহান কমিউনিস্ট নেতা স্ট্যালিনের এই শিক্ষা থেকেও বোঝা যায় যে, সিপিএম যদি সত্যিকারের একটা কমিউনিস্ট পার্টি হত, তবে এভাবে গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও গণতান্ত্রিক অধিকারকে ধ্বংস করত না।

আমরা লক্ষ্য করছি যে, একের পর এক নির্বাচনে সিপিএমের সন্ত্রাস ও রিগিং-এর বুটের তলায় জনমতকে পিষ্ট হতে দেখে, এবং ভোটাধিকার থেকে নিজেরা বারবার বঞ্চিত হয়ে বহু মানুষই হতাশার শিকার হয়েছেন। তাঁরা ভাবছেন, এই অন্ধকারের শেষ কোথায় ? গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ কী ? কী উপায়ে রিগিং ঠেকানো সম্ভব ? আমরা ইতিপূর্বেও বলেছি যে, সিপিএম দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের আশীর্বাদপুষ্ট হয়েই ক্ষমতায় রয়েছে। ভারতবর্ষের শোষক পুঁজিপতিশ্রেণী পশ্চিমবঙ্গে অতীতে গড়ে ওঠা বামপন্থার মর্যাদাকে মসীলিপ্ত করার জন্য, মার্কসবাদ সম্পর্কে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি করার জন্য এবং গণআন্দোলন ও শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামকে পর্যুদস্ত করে অবাধে শোষণলুণ্ঠন চালাবার জন্য তাদের যতদিন প্রয়োজন ততদিন সিপিএম-কে সরকারে বসিয়ে রাখবে। সেজন্য এদেরই অঢেল টাকার জোরে, ক্রিমিনাল বাহিনীর জোরে এবং পুলিশ-প্রশাসনের শক্তিকে ব্যবহার করে সিপিএম ভোটে রিগিং ও সন্ত্রাস চালিয়ে যাবে। যদি কখনও এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে, সিপিএমের বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিক্ষোভ আন্দোলনের রূপে এমন তীব্র আকারে ফেটে পড়ছে যে তাকে ক্ষমতায় রাখাই আর সম্ভব নয়, তখনই, বা তেমন ধরনের উপায়হীন অন্য কোন কারণে সিপিএমকে সরিয়ে বিকল্প হিসাবে তৃণমূল কংগ্রেস, বা কংগ্রেস, বা অন্য কোন বুর্জোয়া জোটের কথা পুঁজিপতিশ্রেণী ভাবতে পারে — যেমন করে '৭৪ সালে জয়প্রকাশজীর নেতৃত্বে ইন্দিরা কংগ্রেস বিরোধী বিক্ষোভ প্রবল আন্দোলনের রূপে সমগ্র ভারতবর্ষে ফেটে পড়ার পরিণতিতেই '৭৭ সালের নির্বাচনে জনতা পার্টির সরকারকে পুঁজিপতিশ্রেণী কেন্দ্রে ক্ষমতায় নিয়ে এসেছিল।

এই অবস্থায় জনতার সচেতন সংঘবদ্ধ গণপ্রতিরোধই সিপিএমের প্রবল রিগিং বহুলাংশে ঠেকাতে পারে এবং একমাত্র একটি বিপ্লবী দলই এই গণপ্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে। তৃণমূল কংগ্রেস বা কংগ্রেসের মত সমমনোভাবাপন্ন কোন বুর্জোয়া দলের পক্ষে এ কাজ সম্ভব নয়। আমাদের দল এস ইউ সি আই দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী সিদ্ধান্তগুলির বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দলের বহু কর্মী এই লড়াই চালাতে গিয়ে পুলিশের লাঠিগুলিতে রক্ত দিয়েছে, প্রাণ দিয়েছে, কারাবন্দী হয়েছে, সিপিএমের ক্রিমিনালদের হাতে খুন হয়েছে। এই আন্দোলনগুলি পরিচালনার জন্য আমরা এলাকায় এলাকায় দলমতনির্বিশেষে সাধারণ মানুষকে নিয়ে গণকমিটি গঠন করার ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। কিছু কিছু জায়গায় আমরা সফলও হয়েছি। সিপিএমের নিচুতলার বহু কর্মী-সমর্থকও এতে সামিল হচ্ছেন। একমাত্র এই গণকমিটি ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীই সিপিএমের রিগিং ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কার্যকরী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে। অন্য কোনও পথে এটা সম্ভব নয়। সুতরাং যারা এই রিগিং বন্ধ হোক চান, তাদের গণআন্দোলন ও গণকমিটিতে সামিল হতে হবে।

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

সুরাটে ভবঘুরে শ্রমিকদের সম্মেলন

পুঁজিবাদী শোষণের অনিবার্য পরিণামে সর্বস্বান্ত হয়ে যারা ভিটেমাটি ছেড়ে গুজরাটে মজুরের কাজ করতে গেছে তারা এক ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন। মূলত পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, ইউ পি, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থান থেকে বহু শ্রমিক গুজরাটের বিভিন্ন শহরে কাজ করছে। শুধু বাইরের থেকেই নয় গুজরাটের গ্রামাঞ্চল থেকেও উচ্ছেদ হয়ে জীবনধারণের সামান্য উপকরণটুকু জোগাড় করতে শহরে ভিড় জমাচ্ছে বাস্তুহারা মানুষ। শহরে আগত এই ভবঘুরে শ্রমিকদের স্থায়ী কোন কাজ নেই। যেখানে কাজ পাচ্ছে করছে, বেতন সামান্য। কিন্তু কাজের বোঝা বিরাট। এদের অবসর নেই, টিফিন করার জন্য সামান্য বিরতিও দেওয়া হয় না। অত্যধিক পরিশ্রমে এরা প্রত্যেকেই ভগ্নস্বাস্থ্য, চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। তদুপরি এদের উপর রয়েছে পুলিশের হয়রানি। প্রায়ই এদের সমাজবিরোধী সাজিয়ে জেলে পোরা হচ্ছে, ছাড়িয়ে আনার জন্য মোটা অঙ্কের টাকা দিতে হচ্ছে। এদের বেতনের একাংশ এজেন্টরাই খেয়ে নিচ্ছে। ভবঘুরে শ্রমিকরা মালিক-পুলিশ ও এজেন্টদের সম্মিলিত আক্রমণে বিপর্যস্ত। শ্রমিকদের এই দুরবস্থায় বিজেপি পরিচালিত গুজরাটের নরেন্দ্র মোদীর সরকারের কোন উদ্বেগ নেই।

এই অবস্থায় অসহায় শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়েছে এস ইউ সি আই গুজরাট রাজ্য সংগঠনী কমিটি। দলের সুরাট ইউনিটের পক্ষ থেকে গত ১২ জুন প্রিয়াঙ্কা নগরের এস ইউ সি আই হলে ভবঘুরে শ্রমিকদের এক বিরাট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন এস ইউ সি আই গুজরাট রাজ্য সংগঠনী কমিটির সম্পাদক কমরেড দ্বারিকা নাথ রথ। বক্তব্য রাখেন কমরেডস্ রাম ভরত মৌর্য, তপন দাশগুপ্ত, দুর্যোধন শেঠি, শিবরাম শেঠি, তরুণ দাশগুপ্ত, সত্যেন্দ্র সিংহ, প্রয়াগরাজ মৌর্য, মুকেশ সেমওয়াল, গণেশ যোশী, সুমন বেন, মদন সিংহ, লালজি তেওয়ারী। মূল প্রস্তাব পেশ করেন কমরেড নভাল কুমার ঝা। এই সম্মেলন থেকে ভবঘুরে শ্রমিকদের নিয়ে আন্দোলন করতে 'মাইগ্র্যান্টস রাইটস্ অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন' গঠন করা হয়। কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচিত হয়েছেন কমরেড দ্বারিকানাথ রথ এবং যুগ্ম আহ্বায়ক হয়েছেন কমরেড নভাল কুমার ঝা। ১১ সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটি স্থানীয় সম্মেলনগুলি করার পথে শীঘ্রই রাজ্য সম্মেলন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বিজেপি'র সমর্থনে পুরবোর্ড দখল
সিপিএম-এর রাজনৈতিক অনৈতিকতার একটি নমুনা

রামপুরহাটে দুই বিজেপি কাউন্সিলরের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থন নিয়ে বোর্ড দখল করল সিপিএম তথা বামফ্রন্ট। বীরভূম জেলার রামপুরহাট পুরসভায় ১৭টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৭টিতে বামফ্রন্ট জেতায় তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। অন্তত দুজন কাউন্সিলরের সমর্থন তাদের দরকার। বিজেপি জিতেছিল দুটি আসনে। বোর্ডের ভোটাভুটিতে একজন বিজেপি ও একজন কংগ্রেস সমর্থিত নির্দল কাউন্সিলর অনুপস্থিত থাকায় ১৫ জন উপস্থিতের মধ্যে ৮টি ভোট বামফ্রন্টের দরকার ছিল। বিজেপির একজন কাউন্সিলরের সমর্থন পেয়ে তারা ৮ ভোট পেয়ে যায় ও বোর্ড দখল করে। (সূত্রঃ দি স্টেটসম্যান, ২৬.৬.০৫)

এই ঘটনা সিপিএম-এর গদিসর্বস্ব অনৈতিক চরিত্রকে প্রকট করে দিয়েছে। বামপন্থী মানুষ ও দলের নিচুতলার কর্মীদের তীব্র সমালোচনার মুখে পড়ে সিপিএম জেলা সম্পাদক বলেছেন — 'ভোট হয়েছে গোপনে। তাহলে কী করে বলা যায় যে আমরা বিজেপির সমর্থন নিয়েছি'! কিন্তু বলা তো যায়ই। অষ্টম ভোটটি তাঁরা কার কাছ থেকে কিসের বিনিময়ে পেয়েছেন তা খুলে না বললেও স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব স্বীকার করেছেন তাঁদের একজন কাউন্সিলর অনুপস্থিত থেকে ও অপরজন সরাসরি ভোট দিয়ে বামফ্রন্টকে বোর্ড দখল করিয়ে দিয়েছে। সংবাদে প্রকাশ, বিজেপির জেলা নেতৃত্ব নাকি তাদের দুই কাউন্সিলরকে দল থেকে বহিষ্কার করার জন্য রাজ্য নেতৃত্বকে অনুরোধ করেছে।

এভাবে বোর্ড দখল করে সিপিএম বুঝিয়ে দিল, সাম্প্রদায়িক বিজেপির বিরুদ্ধে তাদের বুলিগুলো কত ফাঁপা, নীতিগতভাবে তারা কত দেউলিয়া। অবশ্য গদির জন্য সিপিএম-বিজেপি আঁতাত নতুন নয়। ১৯৮৫ সালে কলকাতা পুরসভায় সংখ্যালঘু বামফ্রন্ট বিজেপির দুজন কাউন্সিলরের পরোক্ষ সমর্থনে পাঁচ বছর পুরবোর্ড দখলে রেখেছিল। এ থেকেই প্রমাণ, ভোটের সময় নীতির কথা এরা বলে শুধু লোকঠকাতে। শ্রমিক চাষীকে ঠকাতে এরা মার্কসবাদের বুলি আওড়ায়। বাস্তবে গদির জন্য এরা করতে পারে না হেন কাজ নেই।

১২ জুন প্রিয়াঙ্কা নগরে ভবঘুরে শ্রমিকদের সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন এস ইউ সি আই গুজরাট রাজ্য সংগঠনী কমিটির সম্পাদক কমরেড দ্বারিকা নাথ রথ।

দক্ষিণ দিনাজপুরে বিড়ি শ্রমিকদের শহীদ দিবস পালন

১২ জুন দক্ষিণ দিনাজপুরের লালপুর, ত্রিমোহিনী ও ভাটপাড়ার চারটি জায়গায় বিড়ি শ্রমিক আন্দোলনের প্রথম শহীদ সেখ মুজিবর স্মরণে শহীদ দিবস পালিত হয়। চারটি এলাকার বিড়ি শ্রমিকরা সম্মিলিতভাবে গভীর শ্রদ্ধা ও আবেগের সঙ্গে শহীদ বেদীতে মাল্যদান, ২ মিনিট নীরবতা পালন, ব্যাজ পরিধান ও আলোচনার আয়োজন করেন। এস ইউ সি আই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড সাগর মোদক জেলার সর্বত্র বিড়ি শ্রমিকদের সংগঠিত করার ও বিড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ ফেডারেশনকে মজবুত করে গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়ন

চারের পাতার পর

কিন্তু সোভিয়েট প্রতিরোধ সত্ত্বেও আকস্মিক প্রথম আক্রমণে আক্রমণকারী স্বাভাবিকভাবে যে সুবিধা পেয়ে থাকে, জার্মান বাহিনী সেই সুবিধা পেতে লাগল। ধ্বংসোন্মত্ত ফ্যাসিস্ট সৈন্যদল প্রবল বন্যার মতো সোভিয়েট সীমান্তের সমস্ত আত্মরক্ষা-ব্যবস্থা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে এগুতে লাগল। নিদারুণ বোমাবর্ষণে সোভিয়েটের প্রচুর বিমান, বিমানশালা, বিমান ময়দান, রেলপথ, ট্যাঙ্ক ও অস্ত্রাগার ধূলিসাৎ হয়ে গেল। ২২ জুন থেকে ২৯ জুন — এই এক সপ্তাহ যুদ্ধের শেষে জার্মানপক্ষ সামরিক জয়োল্লাসপূর্ণ এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করল। বাল্টিক তীরবর্তী লিথুয়ানিয়া দখল হয়ে গেল। লাটভিয়ার প্রধান বন্দর রিগা আক্রান্ত। মিনস্কের দিকেও প্রবল জয়ের সম্ভাবনা। দক্ষিণ পোলাণ্ডের প্রিজমিজেল দু'বার হাতবদলের পর জার্মান অধিকারে গেল। লুক এবং লোও দু'বার হাতবদল হল এবং সেখানে শত শত ট্যাঙ্কের সংঘর্ষ আরম্ভ হল। রুমানিয়া সীমান্তে সেরনোভিৎস দখল হয়ে গেল; প্রুথ নদী অতিক্রম করে রুমানিয় সৈন্যেরা আরও দক্ষিণে বোলগ্রাদ শহর দখল করে নিল। ফিনিশ সৈন্যেরা হ্যাঙ্গো বন্দর বোমাবিধ্বস্ত করল ও আলাণ্ড দ্বীপপুঞ্জ দখল করে নিল।

সোভিয়েট-জার্মান যুদ্ধ সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিমের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির বৃহৎ পুঁজিপতি ও ব্যবসায়ী মহলের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, 'সোভিয়েট ইউনিয়ন ও নাৎসি জার্মানির মধ্যেকার যুদ্ধ কেবল তাদের নিজেদেরই (পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলিরই) স্বার্থের অনুকূল হবে। তারা বলত যে, রাশিয়া অবশ্যই পরাস্ত হবে এবং তার ফলে কমিউনিজম বিলুপ্ত হবে, আর এই সংঘর্ষের ফলে জার্মানি সুদীর্ঘ বছরের জন্য হীনবল হয়ে পড়বে এবং বাদবাকি দুনিয়ার পক্ষে তারা আর বাস্তব কোন বিপদ সৃষ্টি করতে পারবেনা। (ওয়েলস্ এস দ্য টাইমস ফর ডিসিশন, নিউইয়র্ক, লণ্ডন, ১৯৪৪)

আমেরিকায় সোভিয়েট বিদ্বেষ

আমেরিকা তখন উঠতি সাম্রাজ্যবাদের স্তরে, কিন্তু বৃটেনের মতে বনেদী সাম্রাজ্যবাদী নয়, যদিও তখন বৃটেনের অবস্থা পতনোন্মুখ। আমেরিকায় ১৯১৮ সাল থেকেই সোভিয়েট বিরোধী প্রচার ক্রমাগত জোরদার করা হচ্ছিল।পরবর্তীকালে ফ্যাসিস্টদের উদ্যোগে সেখানে সোভিয়েটবিরোধী প্রচার ও চক্রান্তের মজবুত ঘাঁটি গড়ে ওঠে। ১৯৩৯ সালের মধ্যে কমপক্ষে ৭৫০টি ফ্যাসিস্ট প্রতিষ্ঠান রাশি রাশি বুলেটিন, পত্রিকা, সংবাদপত্র ও ইশতেহারে দেশ ছেয়ে ফেলেছিল। তাই নাৎসি জার্মানি সোভিয়েটকে আক্রমণ করার সাথে সাথে চারিদিক থেকে ভবিষ্যৎবাণী হতে থাকল যে, সোভিয়েট রাষ্ট্রের পরমায়ু প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। মার্কিন কংগ্রেস সদস্য মার্টিন ডাইস (২৪ জুন, ১৯৪১) ঘোষণা করলেন, 'তিরিশ দিনের মধ্যেই রাশিয়া হিটলারের আয়ত্তে এসে যাবে।' নিউ ইয়র্ক জার্নাল আমেরিকান (২৭ জুন ১৯৪১) লিখল, 'রাশিয়ার দিন শেষ হয়ে এসেছে। বৃটেন বা আমেরিকা কেউ নাৎসী বাহিনীর তড়িৎগতি ধ্বংসাভিযান প্রতিরোধ করতে পারবে না।' পরে (৩০ মার্চ ১৯৪২) আরও লিখছিল, 'আপনারা জানেন রাশিয়ার কাছ থেকে বিশেষ কিছু আমরা আশা করতে পারিনা। ভাল্লুক মানুষের মতো হাঁটে বলেই মানুষের মত চিন্তা করবে — সব সময়ে এ আশা করা চলে না। রুশদের মানসিক প্রকৃতিতে এমন একটা পাশবিক স্বার্থপরতা ও বেইমানির প্রবণতা আছে যা ওদের 'প্রতীক' ঐ বন্য জানোয়ারটারই (ভাল্লুকেরই) স্বভাবগত।' নিউ ইয়র্ক টাইমস (২৯ জুন ১৯৪১) লিখল, '...দক্ষতায়, নেতৃত্বে, শিক্ষায়, সমরসজ্জায় কোন দিক দিয়েই জার্মানদের সঙ্গে রুশদের তুলনা চলে না; কোথায় কাইটেল, ব্রাউচিটস্ — আর কোথায় টিমোশেঙ্কো, বুদেনি। বলশেভিক শোষণ ও কড়া শাসনের চাপে লালফৌজ ঝরঝরে হয়ে গেছে।' তীব্র সোভিয়েট বিরোধী প্রচার চালিয়ে সিকাগো ট্রিবিউন (২৪ আগস্ট ১৯৪৩) লিখেছিল, 'স্ট্যালিন তাঁর তথাকথিত বন্ধুদের থেকে যা পেতে পারেন, তার চেয়ে যদি জার্মানির থেকে অল্প আয়াসে অনেক বেশি জিনিস আদায় করতে পারেন, তাহলে এ দুয়ের মধ্যে কোন্‌টা এই স্বার্থসর্বস্ব স্বভাব-জোচ্চোরের পক্ষে বেছে নেওয়ার স্বাভাবিক? সারাটা জীবন ধরে ক্রেমলিনের এই জর্জিয়ানটির যে পরিচয় পাওয়া গেছে তা হল নির্বিকার স্বার্থপরতা। এই লোভ আর স্বার্থপরতা স্ট্যালিনের স্বভাবসিদ্ধ।' ১৯৪১ সালে মার্কিন সিনেটর (পরবর্তীকালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট) হ্যারি ট্রুমান মার্কিন সরকারের উদ্দেশে বললেন, ''জার্মানরা জিততে থাকলে আমাদের উচিত রুশদের সাহায্য করা, আর রুশরা জিততে থাকলে আমাদের উচিত জার্মানদের সাহায্য করা; এইভাবে ওরা যত পারে লোক খুন করুক।'' (নিউ ইয়র্ক টাইমস্ ২৪ জুন, ১৯৪১) অর্থাৎ পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের এই পরিকল্পনা, স্ট্যালিনের ভাষায় —''ওরা পরস্পরকে দুর্বল করুক, ধ্বংস করুক; যখন ওরা যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়বে তখন তাঁরা (পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীরা) মঞ্চে অবতীর্ণ হবেন পূর্ণশক্তি নিয়ে — অবশ্যই 'শান্তির স্বার্থে' এবং যুদ্ধ চালিয়ে দুর্বল হয়ে পড়া রাষ্ট্রগুলির উপর শর্ত চাপাবেন। কী সস্তা ও সহজ!'' (সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির অষ্টাদশ কংগ্রেসের ভাষণ) (ক্রমশঃ)

সহায়ক গ্রন্থ ঃ

১। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ — সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ঃ ভিক্টর মাৎসুলেনকো
২। Russia Resists : Pat Sloan
৩। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস ঃ বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
৪। শমীবৃক্ষ (স্ট্যালিন সংখ্যা)

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in